শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

৩য় সংখ্যা - ১ম বর্ষ নভেম্বর ২০২০

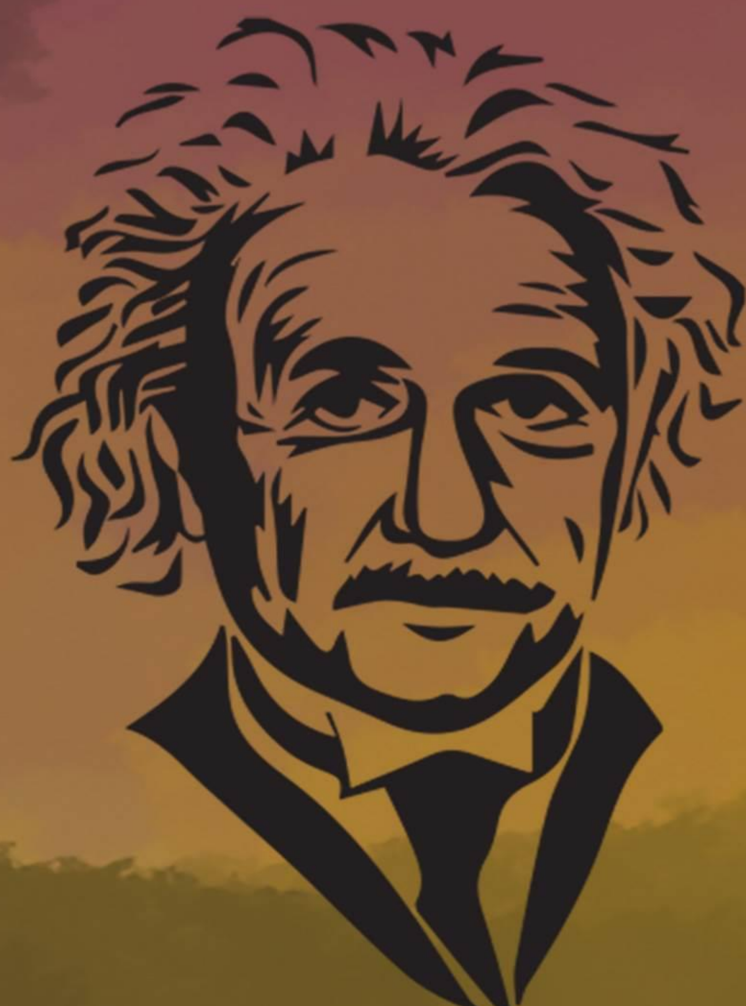

আইনস্টাইন

ন্যানোটেক

কোয়ান্টাম জগত

জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রোগ্রামিং

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত

বিজ্ঞানাঙ্গন

বর্ষ ১ · সংখ্যা ৩

নভেম্বর ২০২০

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭ · মুহাররাম-সফর ১৪৪২

সম্পাদক

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

সহ-সম্পাদক

ইসরাতুল মারিয়া, তামরীন জাহান

প্রচ্ছদ

মীর অম্লান, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

ডিজাইন ও লেআউট

শিফাজ আহমেদ, মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

প্রকাশক

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল, শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব

শিক্ষা ওয়েব প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত।

© ২০২০ শিক্ষা ওয়েব। প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৩, ২০২০ (শুক্রবার)

মূল্য: বিনামূল্য (০০ টাকা)

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

বিজ্ঞান চর্চাকে বেগবান করতে চালু করা নিয়মিত দ্বিমাসিক ই-ম্যাগাজিন ‘বিজ্ঞানাঙ্গনের তৃতীয় সংখ্যায় চলে এলাম, দেখতে দেখতে। এই সংখ্যায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানকে।

পদার্থবিজ্ঞানের জন্ম কিন্তু এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই। মহাবিশ্বের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সূচনা হয় স্থান-কালের। যার উপর ভিত্তি করে আছে সবকিছুই। এভাবে এগিয়ে চলছে আমাদের এই মহাবিশ্ব। যার কিনা মাত্র ৪% হয়ত আমরা জানতে পেরেছি। সেই সীমাহীন মহাবিশ্বের রহস্যের সন্ধানেই এই মাসের ‘বিজ্ঞানাঙ্গন’-কে সাজানো হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান প্রেমীদের জন্য।

আগামী সংখ্যা থেকে আরও বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে বলে আশা করছি। শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞানাঙ্গনের সাথেই থাকুন।

- মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

প্রকাশক, বিজ্ঞানাঙ্গন
প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব

ইমেইল: editor@bigganangon.shikkhaweb.com
ওয়েবসাইট: https://bigganangon.shikkhaweb.com
পেইজ: https://www.facebook.com/SWBigganangon
বিজ্ঞান ক্লাবের ওয়েবসাইট: https://scienceclub.shikkhaweb.com
বিজ্ঞান ক্লাবের পেইজ: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC
বিজ্ঞান ক্লাবের গ্রুপ:
https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebSC

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

সূচিপত্র

পদার্থবিজ্ঞান

অনিশ্চয়তা
মোঃ শহিদুল্লাহ ৩১

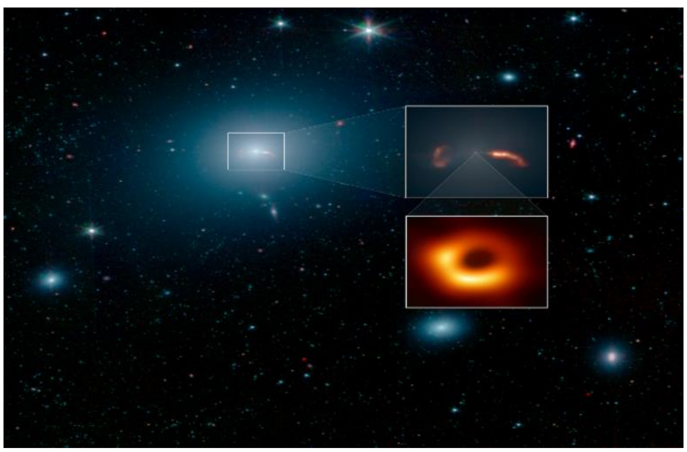

রহস্যময় ব্ল্যাকহোল
ইখতেদার উদ্দিন আকিব ৩৯

আলোক উৎস
আহমেদ নির্ঝর ৪৫

ফিচার

নোবেল পুরস্কার ২০২০ ০৯

ন্যানোপ্রযুক্তির উত্থান ও ভবিষ্যৎ ১৬

নিয়মিত বিভাগ

জীবনী

আলবার্ট আইনস্টাইন ৩৫

পদার্থবিজ্ঞান ৭৮

জ্যোতির্বিজ্ঞান ১১

গণিত ২০

বই রিভিউ ৩৪

কুইজ ২৯

প্রযুক্তি

সি প্রোগ্রামিং: পাঠ শূণ্য ২৪

অ্যাপ রিভিউ ৪৩

ডাউনলোড

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

বিজ্ঞানাঙ্গন ম্যাগাজিনে লেখা দিতে আগ্রহী?

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. লেখা সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় হতে হবে। কোন প্রকার কপি থাকলে লেখা প্রকাশিত হবে না।

২. লেখা ৮০০-১, ১০০ শব্দের হতে হবে।

৩. দুটো লেখা পাঠাতে হবে। সেখান থেকে বাছাই করে এক সংখ্যায় একটি কিংবা দুটিই প্রকাশিত হতে পারে।

৪. বিজ্ঞান সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে (যেমন: পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, প্রযুক্তি, অণুজীববিজ্ঞান ইত্যাদি) লেখা যাবে।

৫. লেখাকে ওয়ার্ড ফাইলে (.docx) পাঠাতে হবে। ফরম্যাটিং করার প্রয়োজন নেই। সাথে ছবি সংযুক্ত করতে হবে। তবে কেউ যদি ওয়ার্ড ফাইল তৈরি করতে সক্ষম না হন, তিনি ইমেইলে টেক্সট আকারে লেখা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সাথে প্রয়োজনীয় ছবিও পাঠাতে হবে।

৬. লেখার শেষে এক বা একাধিক সূত্র দিতে হবে যেন আমরা আপনার লেখা যাচাই করতে পারি।

৭. লেখা হাস্যরসাত্মক ধারায়ও লেখা যাবে।

৮. লেখা পূর্বে কোথাও (ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে) প্রকাশিত হওয়া যাবে না।

লেখা পাঠানোর জন্য করনীয়:

আমাদেরকে আপনার লেখাটি ওয়ার্ড ফাইল আকারে অথবা টেক্সট আকারে editor@bigganangon.shikkhaweb.com এই ইমেইল অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে। সাথে আপনার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের নাম, ডিপার্টমেন্ট বা গ্রুপের নাম, সেশন, ফেসবুক অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক এবং মোবাইল নাম্বার পাঠাতে হবে। আপনার লেখা পাওয়ার পর এবং সিলেক্ট হওয়ার পর আপনাকে মেইল করে জানানো হবে।

নোট: সম্পাদকমণ্ডলী যেকোনো লেখা গ্রহণ কিংবা বাতিল উভয়েরই অধিকার রাখে। এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

দাবি পরিত্যাগ

আমাদের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল লেখা আমাদের কপিরাইটে থাকলেও, ব্যবহৃত ছবিগুলো আমাদের নয়। সেগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে সেসব ওয়েবসাইট ছবিগুলোর সর্বসত্ত্ব সংরক্ষণ করে।

আমাদের সাথে যুক্ত হও!

Websites:

Main: https://www.shikkhaweb.com

English Club: https://englishclub.shikkhaweb.com

Science Club: https://scienceclub.shikkhaweb.com

Blog: https://blog.shikkhaweb.com

Ask: https://ask.shikkhaweb.com

Bigganangon: https://bigganangon.shikkhaweb.com

Press: https://press.shikkhaweb.com

Facebook Pages:

Main: https://www.facebook.com/ShikkhaWeb

Team: https://www.facebook.com/ShikkhaWebTeam

English Club: https://www.facebook.com/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.facebook.com/ShikkhaWebSC

Bigganangon: https://www.facebook.com/SWBigganangon

Facebook Groups:

Main: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWeb

English Club: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.facebook.com/groups/ShikkhaWebSC

LinkedIn:

Main: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWeb

English Club: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWebEC

Science Club: https://www.linkedin.com/company/ShikkhaWebSC

Bigganangon: https://www.linkedin.com/company/Bigganangon

Others:

Twitter: https://www.twitter.com/@ShikkhaWeb

Instagram: https://www.instagram.com/ShikkhaWeb

পূর্বের ম্যাগাজিন দুটো বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে

এখানে ক্লিক করুন

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২০

নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে জানে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নোবেল পুরস্কার মূলত দেয়া হয়, সুইডিশ উদ্ভাবক **আলফ্রেড নোবেলে**র দান করা অর্থে। সেজন্যই তার নামানুসারে এই পদকের নাম হয় '**নোবেল পুরস্কার**'। নোবেল পুরস্কারকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার বলে ধরা হয়।

আলফ্রেড নোবেল তার জীবদ্দশায় ৩৫৫টি উদ্ভাবন করেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেন। এর বেশিরভাগই আসে **ডিনামাইট** থেকে। শুরুতে এটি ৫টি ক্ষেত্রে দিলেও এখন ৬টি ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

সেগুলো হল:

১. পদার্থবিজ্ঞান

২. রসায়ন

৩. চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যা

৪. বিশ্ব শান্তি

৫. সাহিত্য

৬. অর্থনীতি

এরমধ্যে অর্থনীতি ১৯৬৯ সাল থেকে এবং বাকিগুলো ১৯০১ সাল থেকে প্রবর্তিত।

২০২০ সালের বিজ্ঞান বিষয়ে নোবেল পুরস্কার

আমরা ২০২০ সালের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা ও শরীরবিদ্যা এবং অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সম্মন্ধে জানবো এবার।

পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞানে এবছর নোবেল বিজয়ী হয়েছেন একত্রে তিনজন। তারা হলেন আন্দ্রেয়া গেজ (যুক্তরাষ্ট্র), রেইনহার্ড গেনজেল (জার্মানি), রজার পেনরোজ (যুক্তরাজ্য)।

ছায়াপথের কেন্দ্রে একটি সুপারম্যাসিভ কমপ্যাক্ট অবজেক্টের আবিষ্কার করেছেন আন্দ্রেয়া ও রেইনহার্ড। আর রজার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী বলিষ্ঠকরণে ব্ল্যাকহোল অবিষ্কার করেছেন।

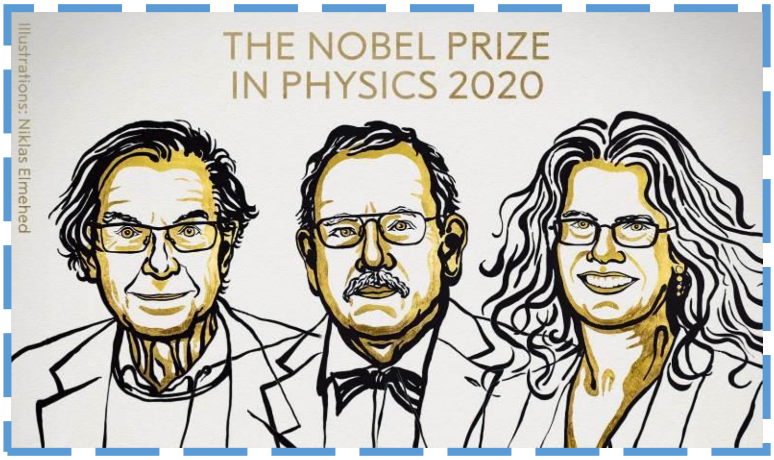

রসায়ন

রসায়নে নোবেল বিজয়ী হয়েছেন দু’জন - এমানুয়েল শারপন্টিয়ের (ফ্রান্স) এবং জেনিফার ডাউডনা (যুক্তরাষ্ট্র)। তারা জিনোম এডিটিংয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

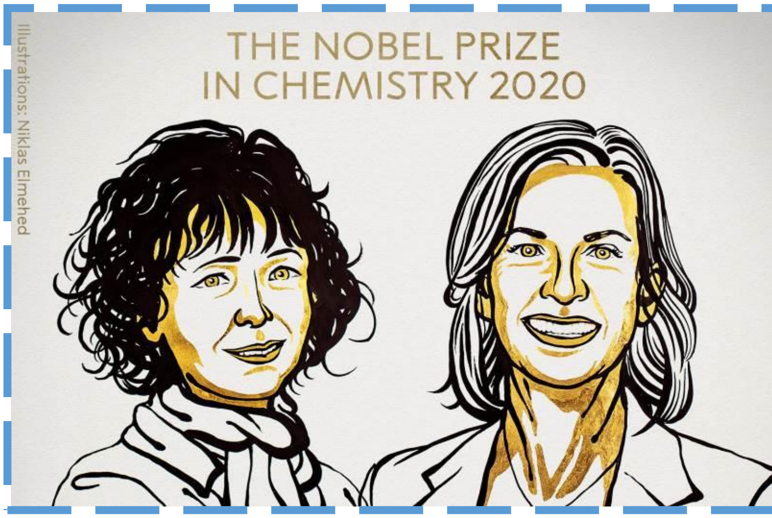

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যা

এক্ষেত্রে নোবেল বিজয়ী তিনজন। তারা হলেন: হার্ভে জে আল্টার (যুক্তরাষ্ট্র), চার্লস রাইস (যুক্তরাষ্ট্র), মিকায়েল হগটন (যুক্তরাজ্য)। তারা হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস শনাক্ত এবং এর চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

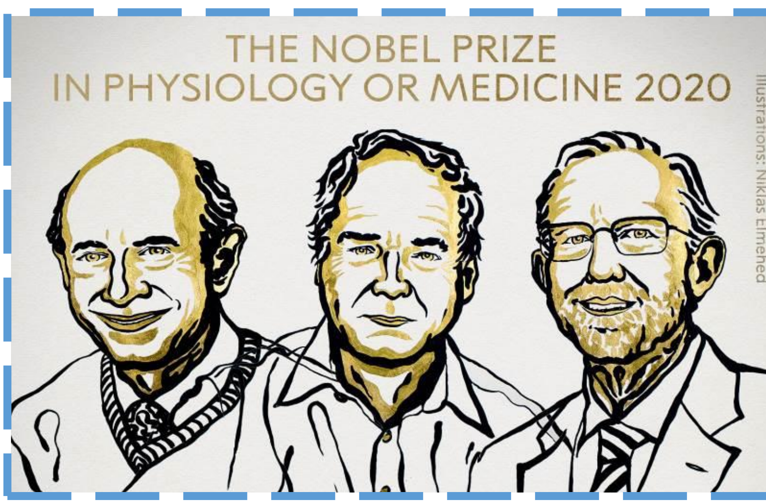

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

যখন থামবে কোলাহল

আবদুল গাফফার

অন্ধকার আর নির্জনতাকে বড্ড ভালোবাসতেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ।
আকাশের কাছে গভীর আঁকুতি ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন-

"এখন পবিত্র অন্ধকার;   হে আকাশ,   হে কাল শিল্পী,   তুমি আর সূর্য জাগিয়ো না; "

জীবননান্দের কথা কি শুনবে আকাশ? সূর্য কি সত্যিই আর জাগবে না?

সৃষ্টির গোড়ার দিকে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মহাজাগতিক মেঘ। হাইড্রোজেনের মেঘ। সেসব মেঘ মহাকর্ষ বলের আকর্ষণের প্রথমে জড়ো হতে শুরু হয়। যত কাছাকাছি হয় হাইড্রোজেনের মেঘ, মহাকর্ষ বলের প্রভাব আরো বাড়ে। ফলে দ্রুত সংকুচিত হতে শুরু করে হাইড্রোজেন মেঘ। বাড়তে থাকে হাইড্রোজনের ঘনত্ব। খুব কাছাকাছি চলে আসে হাইড্রোজেনর পরমাণুগুলো। সঙ্গে বাড়ে হাইড্রোজেন পরমাণুগলির গতিও ধাক্কা খায় একে অপরের সাথে। সেই

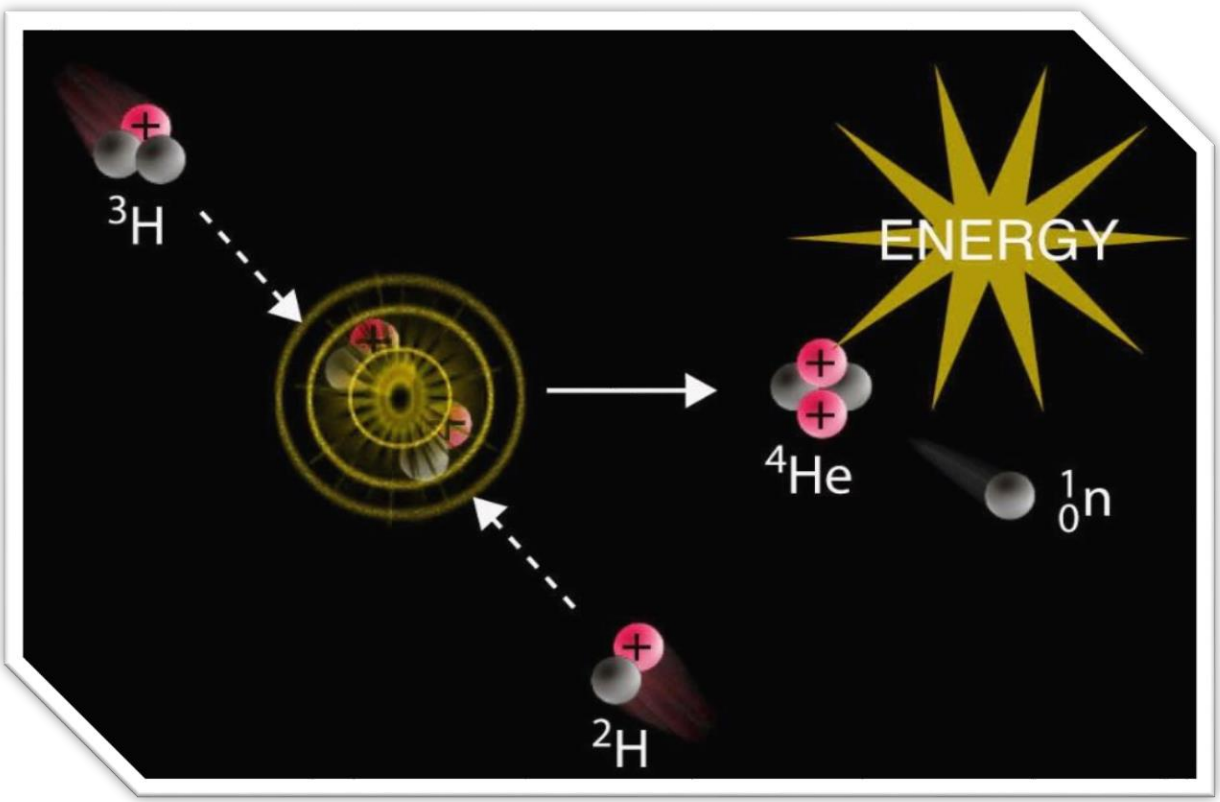

ধাক্কায় জন্ম হয় তাপের। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন পরমাণুর ধাক্কায় জন্মানো তাপের পরিমাণ কম নয়। তাই হু হু করে বাড়তে থাকে হাইড্রোজেন মেঘের তাপমাত্রা। এক সময় তাপমাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যখন ঘটে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। নিউক্লিয়ার ফিউশন। একটা হাইড্রোজেন পরমাণু আরেকটার সাথে জোড়া লেগে তৈরি করে নিউক্লিয়ার বন্ধন। দুটিতে মিলেমিশে বনে যায় হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে। এভাবেই চলে হাইড্রোজেনের হিলিয়াম গড়ার খেলা। একটা সময়

হাইড্রোজেন মেঘ আর আর মেঘ থাকে না। তীব্র মহাকর্ষীয় টানে সেটা একটা গোলকের চেহারা পায়। নিউক্লিয়ার ফিউশনে যতটুকু তাপশক্তি দরকার হয় তার পুরেটাই কিন্তু কাজে লাগে না। কিছু তাপশক্তি হিলিয়াম তৈরির পরেও অবশিষ্ট রয়ে যায়। হাইড্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষ আর ফিউশন থেকে তৈরি হওয়া তাপশক্তি আর উত্তপ্ত করে তোলে গোলকটাকে অগ্নি গোলক। নাকি নরক কুণ্ড! সেটাই তখন হয়ে ওঠে তাপ আলোক শক্তির বিরাট আধার। বলার অপেক্ষা রাখে না উত্তপ্ত সেই অগ্নিগোলকই একেকটা নক্ষত্র। বড় মাঝারি ছোট কত রকম নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। আমাদের সূর্যও একটা নক্ষত্র। একটা নক্ষত্র কতকাল জ্বলবে, তা নির্ভর করে নক্ষত্রের ভেতরকার হাইড্রোজেনের মোট পরিমাণের ওপর। শুধু হাইড্রোজেনই নক্ষত্রের জন্মকালের সঙ্গী। যে নক্ষত্রের ভেতর হাইড্রোজেন যত বেশি, তার ভরও ততো বেশি। নক্ষত্রের ভরের ওপর নির্ভর করে সে কতকাল জ্বলবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন, কোনো নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের তিনগুন হয়, তাহলে সেই নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মাত্র দুই কোটি বছরেই ফুরিয়ে যাবে। কারণ ভর বেশি হলে মহাকর্ষীয় শক্তিও বেড়ে যায়। ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হাইড্রোজেনের ওপর আরো বেশি মাত্রায় চাপ পড়ে। তাই হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসগুলো দ্রুত পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। সেই অনুপাতে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় প্রচণ্ডভাবে। সেকারণে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের চলে খুবই দ্রত তালে। ফলে দ্রুত ভেতরের হাউড্রোজেন জ্বালানী ফুরিয়ে আসে। বাড়তে থাকে পরমাণুর হিলিয়ামের সংখ্য।

কিন্তু সূর্যের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা দ্রুত নয়। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সূর্যের জন্মকালে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন এর ভেতর জড়ো হয়েছিল, স্বভাবিক ভাবে সেটা নিঃশেষ হতে এক হাজার কোটি বছর সময় লাগবে। তারপর? এখন সূর্যের বয়স প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি বছর। মোট আয়ুর মধ্য গগণে। তার মানে আরো প্রায় ৫শ' কোটি বছর হাতে আছে সূর্যের।

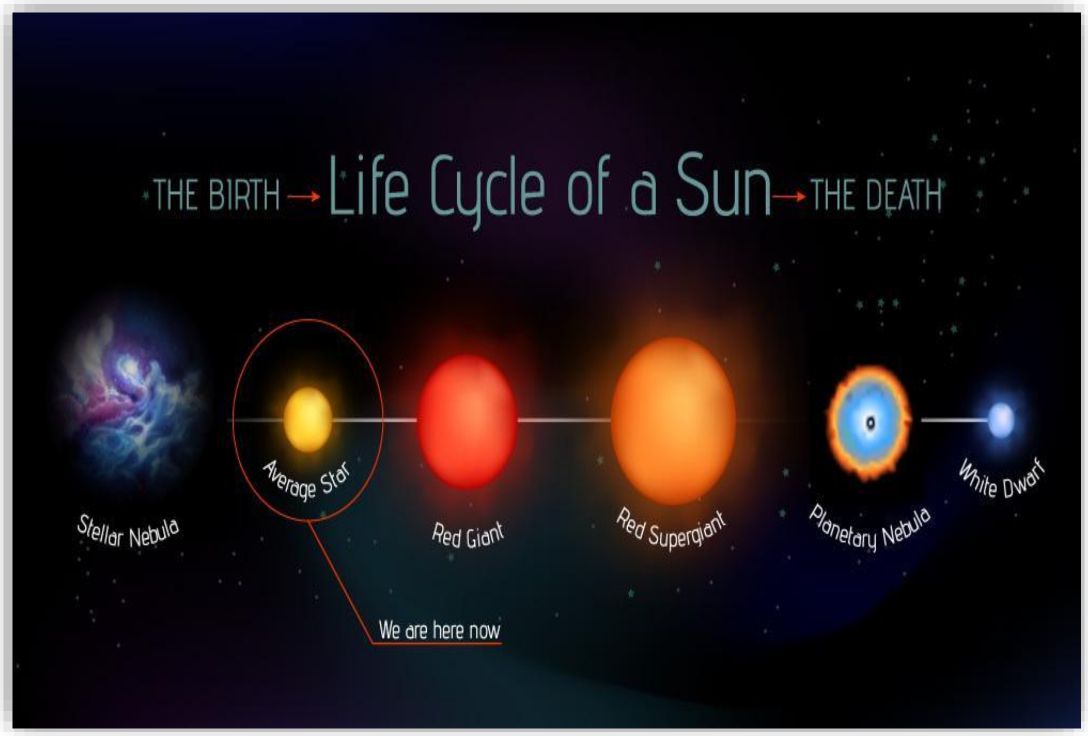

সূর্যের কেন্দ্রীয় চলছে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। হাইড্রোজেন পুড়ছে। তৈরি হচ্ছে হিলিয়াম। একদিন সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হাইড্রোজেন প্রায় ফুরিয়ে আসবে। একসময় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করার মতো হাউড্রোজেন তেমন থাকবে না। বাড়বে হিলিয়ামের ঘনত্ব। সেসব হিলিয়াম মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরে কাছে আসতে চাইবে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে, তৈরি হবে বিপুল পরিমাণ তাপ। কিন্তু সেই তাপ কাজে লাগিয়ে হিলিয়ামের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ঘটবে খুব কম। বিশাল পরিমাণ তাপশক্তি তাই জমা হবে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কেন্দ্রে থাকে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন আর

বাইরে হিলিয়ামের স্তর। প্রচণ্ড সংকোচনের দরুণ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে সেটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই উত্তাপের প্রভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বহিরাবরণটা প্রসারিত হতে থাকে। প্রসারণের কারণে কমতে থাকবে তাপমাত্রাও। আবার ইচ্ছে করলেই সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটা তো আর দেখতে পাই না। দেখতে পাই বাইরের পৃষ্ঠটা। যেহেতু তাপমাত্রা অনেকটাই খুঁইয়ে ফেলেছে, তাই এর উজ্জ্বলতা হয়ে গেছে অনেকটাই ফিকে তাই সূর্যটাকে আর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দেখাবে না। দেখাবে টকটকে লাল একটা গোলকের মতো।

কামারের হাপরের তলায় থাকা একটা উত্তপ্ত লোহার কথা ভাবাা যাক। লোহা যখন খুব গরম থাকে তখন একরকম দেখায়, তাপমাত্রা কমলে তার চেহারা আবার আরেক রকম। কম তামাত্রার লোহাকে টকটকে লাল রঙের দেখায়। বাইরের পৃষ্ঠ সম্প্রসারণের পরে সূর্যকেও এমনই লাল দেখাবে। লাল রংয়ের এই অতিকায় সূর্যটাকে তখন বলা উচিত রেড জায়ান্ট বা লোহিত দানব বা লাল দানব বা রক্তিম দৈত্য। এখন সূর্যের বাইরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন। লোহিত দানবে পরিণত হলে এই তাপমাত্রা কমে দাঁড়াবে ৩০০০ ডিগ্রি কেলভিনে। ব্যাসার্ধ বেড়ে হবে এখনকার ব্যাসার্ধ্যের ১০০ গুণ। ওই অবস্থায় সূর্য গ্রাস করবে বুধ গ্রহকে।

কিন্তু খেলা এখানেই শেষ নয়। লোহিত দানবে পরিণত হওয়া সুর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হিলিয়াম নিউক্লিয়াস মহাকর্ষীয় টানে সংকুচিত হতে থাকবে। তাদের ভেতরও সংর্ঘর্ষ হবে, তৈরি হবে তাপ। সেই তাপশক্তি হিলিয়ামের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ঘটাবে। আবার প্রাণ ফিরে পাবে সুর্যের লোহিত দানব। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া এবং তা থেকে তৈরি হওয়া তাপশক্তি বাড়িয়ে দেবে লাল দানবের তাপমাত্রা ও উজ্জ্বলতা। লোহিত দানবের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা উঠে যাবে ১০ কোটি ডিগ্রি কেলভিনে।

সবকিছুরই একটা শেষ থাকে। লোহিত দানবের ভেতরে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াও চিরকাল চলতে থাকবে না। হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এ প্রক্রিয়া কার্বন নিউক্লিয়াস জন্ম দেবে। সেই কার্বন নিউক্লিয়াস কমিয়ে দেবে লোহিত দানবের তাপমাত্রা। তাই এতক্ষণ তাপশক্তি আর মহাকর্ষ শক্তির যে লড়াই দেখেছি সেটাতে জয়ী হবে মহাকর্ষ। কিন্তু তবু শেষ হাসি সে হাসতে পারবে না। তখন আসবে নতুন বাধা। লোহিত দানবে পরিণত হওয়া সুর্যের কেন্দ্রে জমা হবে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মুক্ত ইলেকট্রন। তার চারপাশে হিলিয়ামের আবরণী। ভেতরে

আবার কার্বনও আছে। কিন্তু ইলেকট্রন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। সেই বিকর্ষণ শক্তিও তো কম নয়। ইলেক্রেটনগুলি পারস্পারিক বিকর্ষণের কারণে কেন্দত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা হতে দেবে না মহাকর্ষীয় বল। গোটা সুর্যের হিলিয়াম পরস্পরকে আকর্ষণ করে চুপসে যেতে চাইবে। এজন্য বাড়বে সূর্যের লোহিত দানবের ঘনত্ব। প্রবল একটা কেন্দ্রমুখি আকর্ষণ বল তৈরি হবে। কেন্দ্রবিন্দুর দিকে চুপসে যেতে চাইবে গোটা সূর্যের দেহ। কিন্তু পুরোপুরি চুপসে যেতে পারবে না ইলেকট্রনের বিকর্ষণজনিত বহির্মুখি চাপের কারণে। ফলে দুই চাপের একটা মরীয়া লড়াই জমবে মরে যাওয়া সূর্যের কেন্দ্রের দিকে। তার ফলে হিলিয়ামের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হবে বিক্ষিপ্তভাবে। তাতে হয়তো লোহিত দানবের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়বে, বাড়বে উজ্জ্বলতাও। কিন্তু সেই তাপ আর উজ্জ্বলতা লোহিত দানবের বিশাল আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে মাঝে লোহিত দানবের ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটবে। সেই বিস্ফোরণের শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে মহাকর্ষীয় টানের বিপক্ষে লড়তে লড়তেই। শেষ পর্যন্ত হিলিয়াম নিউক্লিয়াসগুলো ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনে পরিণত হয়।

তারপর কি কার্বনের নিউক্লিয়াসেরও ফিউশন হওয়া কি সম্ভব?

সম্ভব যদি পর্যাপ্ত তাপমাত্রার জন্ম দিতে পারে। সেজন্য খুব বেশি ভরের নক্ষত্র হলে সম্ভব হতো। তাহলে প্রবল মহাকর্ষীয় বলের কার্বন পরমাণুর মধ্যে সংর্ঘষ হতো খুব বেশি মাত্রায় । তাপও হতো ততো বেশি। কিন্তু সূর্যের অত ভরও নেই, কার্বন পরমাণুর ফিউশনের জন্য সে পর্যাপ্ত মহাকর্ষ বলের জোগান দিতে পারবে না। তাই কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কার্বণের ফিউশন হবে না। কেন্দ্রের চারপাশে থাকবে হিলিয়ামের আবরণ। সেই আবরণী স্তরে ফিউশন হতে অসুবিধা নেই। এই ফিউশনর থেকেও তাপ জন্ম নেবে। উজ্জ্বলতা বাড়বে হিলিয়াম আবরণীর। সেইসঙ্গে আবরণী ফুলে ফেঁপে আরো বড় হবে। আরো উজ্জ্বল হয়ে হয়ে উঠবে সূর্যের রক্তিম দানব।

এক সময় আবরণীর হিলিয়াম সব ফুরিয়ে যায়। কার্বন নিউক্লিয়াসের ছড়াছড়ি তখন। তাপমাত্রাও তখন অনেক কমে আসে। তখন কার্বন নিউক্লিয়াসগুলো মুক্ত ইলেকট্রন ধরে নিয়ে কার্বন পরমাণু তৈরি করে। এসশয় আলোর ফোটন কণা বিকিরিত হয়। সেই ফোটন আবার লোহিত দানবের বাইরের আবরণে শোষিত হয়। ফলে আবরণীর তাপমাত্রা বাড়ে এবং প্রসারিত হয়। প্রসারণের কারণে আবার কমতে থাকে আবরণীর তাপমাত্রা। তখন আবার সংকুচিত হয় আবরণী। বার বার এভাবে সংকোচন-প্রসারণল চলে। একসময় আবরণী স্তরটির ভারসাম্য আর থাকবে না। সেটা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সূর্য থেকে। উন্মুক্ত হয়ে যাবে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

এই অবস্থায় সূর্য চুপসে যাওয়ার কথা। কিন্তু পুরোপুরি সেটা হতে দেবে না কেন্দ্রের সেই ইলেকট্রন পিণ্ড। মৃতপ্রায় সূর্যের ব্যাস তখন দাঁড়াবে মাত্র ২০ হাজার কিলোমিটারে। আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণের কম! সূর্যের উজ্জ্বলতা দাঁড়াবে এখানকার উজ্জ্বলতার ১০০ গুণ কম। মহাকাশে ধুঁকতে থাকা একটা শ্বেত বামনে পরিণত হবে সূর্য। টিম টিম করে জ্বলা সেই সুর্যের কথা ভাবতে কেমন লাগে। দোর্দণ্ড প্রতাপ নেই। কাছের গ্রহগুলোকে লোহিত দানব অবস্থায় গিলে ফেলেছে। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। স্পন্দন নেই সৌরজগত সিস্টেমেই। ধীরে ধীরে হিমশীতল মহাশূন্য শ্বেতবামনরূপি সূর্যের তাপমাত্রা শুষে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে সেটা সাদতা থেকে হলুদ তারপর আরো ক্ষীণ রংযের গোলকে পরিণত হচ্ছে। তারপর একদিন সব শেষ। নিভে যাবে শেষ আলোকছটাও। একটা কালো গোলকে পরিণত হয়ে সূর্যের সবদেহ ভেসে রবে অন্ধকার মহাশূন্যের অতলে।

লেখক: সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

ন্যানোপ্রযুক্তির উত্থান ও ভবিষ্যৎ

ফারহান কবির

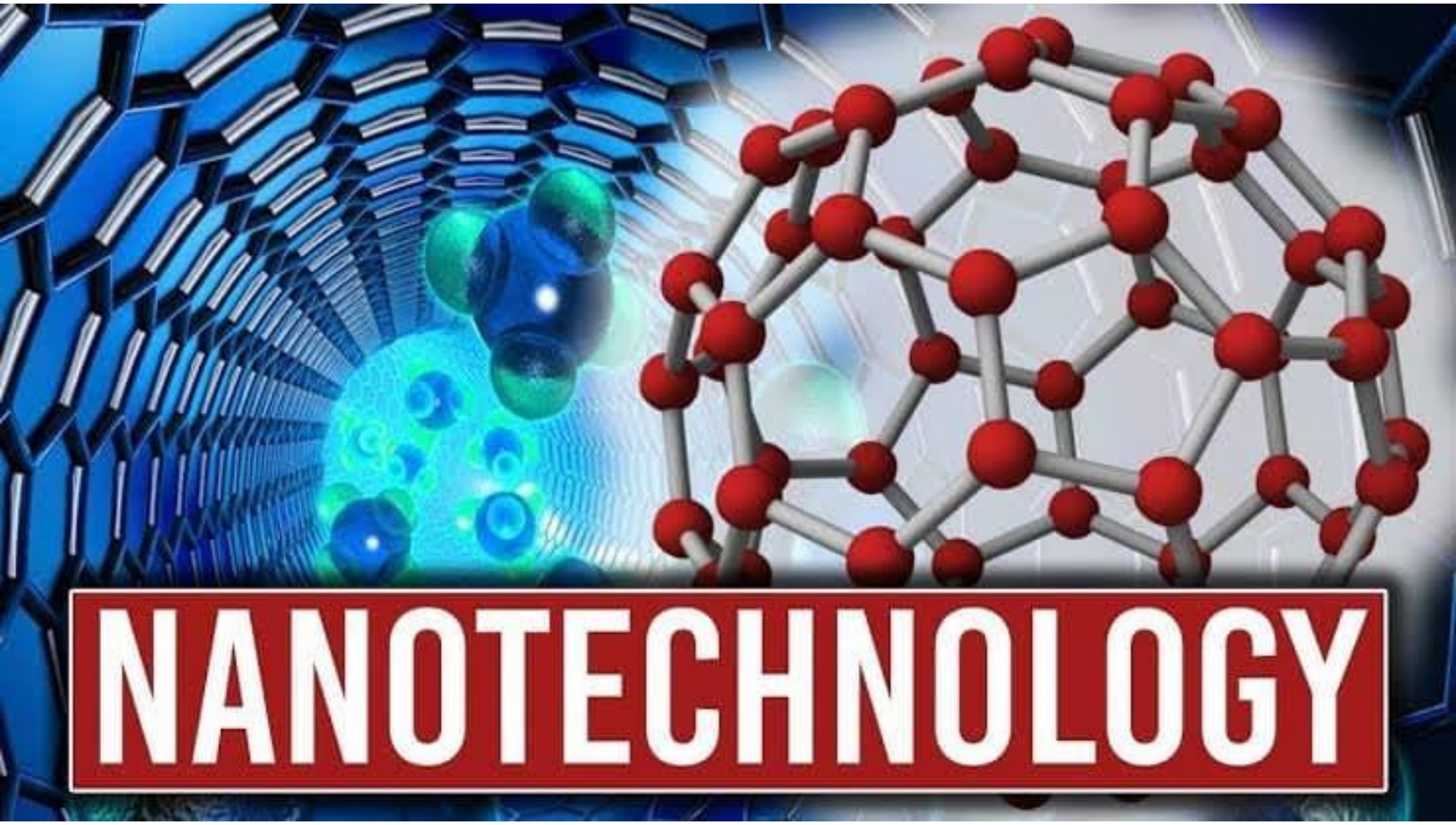

বিজ্ঞানের চমৎকার সব আবিষ্কারের মধ্যে ন্যানোপ্রযুক্তি অন্যতম। বলাই বাহুল্য, ন্যানোপ্রযুক্তি মানুষের জীবনকেই বদলে দিয়েছে।

ন্যানো প্রযুক্তি হচ্ছে পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরির জন্য ধাতব বস্তুকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি। সাধারণত ন্যানোপ্রযুক্তি এমন সব কাঠামো নিয়ে কাজ করে যা অন্তত একটি মাত্রায় ১০০ ন্যানোমিটার থেকে

ছোট। ন্যানোপ্রযুক্তির প্রথম ধারণা পাওয়া যায় ১৯৫৯ সালে। আমেরিকান বিখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান তার "There is plenty of Room at the Bottom" এ প্রথম ন্যানোপ্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৮০ সালে IBM এর গবেষকেরা প্রথম STM (Scanning Tunneling Microscope) আবিষ্কার করেন যা দিয়ে অণুর গঠন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এই যন্ত্রের আবিষ্কারই ন্যানোপ্রযুক্তি বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তাই ৮০-র দশককে ন্যানোপ্রযুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে ধরা হয়।

ন্যানো টেকনোলোজি আমাদের জীবনে আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলেছে, জীবনকে করেছে আরও সহজ। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়নসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এমনকি সিনেমা জগতেও রয়েছে ন্যানো টেকনোলোজির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। ন্যানোপ্রযুক্তির একটি সুবিধা হচ্ছে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য অন্তত ছোট স্কেলে উপকরণগুলির কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ 'North Carolina State University'-র গবেষকেরা হৃদযন্ত্রের ক্ষতিকর কোষগুলিতে সরবরাহকৃত স্টেম সেলের পরিমাণ বারানর জন্য স্টেম সেলগুলিতে আঘাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ন্যানভেসিকলগুলি যুক্ত করেন। এছাড়া রক্তে ক্যান্সার সেল আবিস্কারে ন্যানোটিউব ব্যবহৃত হচ্ছে।

ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে সিনেমা জগতেও! যেমন ২০০২ সালের ছবি 'Spider-Man' এ পিটার ড. নরম্যানকে তার ন্যানোপ্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। ১৯৯৬ সালের 'Star Trek: First Contact' এও ন্যানো টেকনোলোজি ব্যবহার হয়েছিল। এছাড়া বহুল আলোচিত ছবি "Avengers: Infinity War"-এ আয়রনম্যানকে ন্যানো টেকনোলোজি দিয়ে বানানো স্যুট ব্যবহার করতে দেখা যায়।

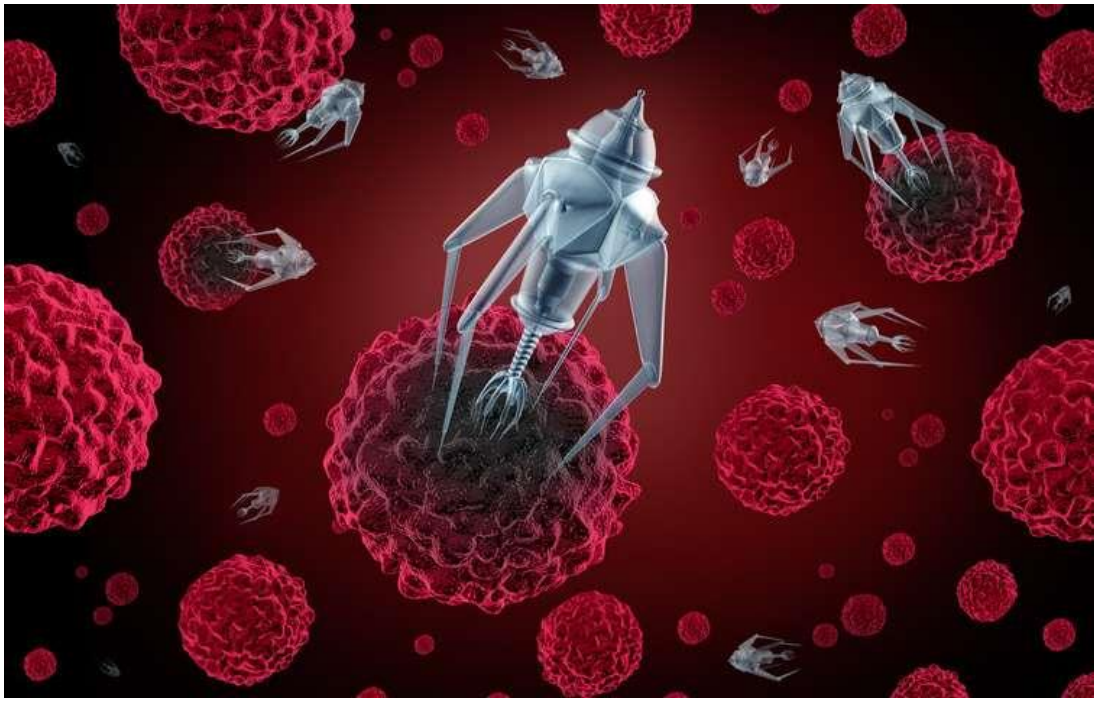

ন্যানোপ্রযুক্তির অন্যতম সফল ব্যবহার হচ্ছে মহাকাশ বিজ্ঞানে। মহাকাশকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে ন্যানোপ্রযুক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। মহাকাশ অনুসন্ধানের ভবিষ্যৎ এ ন্যানোপ্রযুক্তি খুবই

গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সাথে জড়িত সবাইকে ন্যানোপ্রযুক্তি অবাক করে দিচ্ছে। বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে একটি হচ্ছে স্পেস লিফট যা অতি খুদ্র কার্বন ন্যানোটিউব ব্যবহার করে বানানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ১৮৯৫ সালে ধারণা পাওয়া স্পেস লিফট বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে নির্মাণ করা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। স্পেস লিফট তৈরি করতে অতি শক্তিশালি কেবল প্রয়োজন। এর জন্য কার্বন ন্যানোটিউব একটি সম্ভাব্য উপাদান যদি এ গুলিকে যথেষ্ট দির্ঘায়িত করা যায়। যদিও আজ পর্যন্ত বানানো কেবলগুলি দুর্বল কে জানে ভবিষ্যতে শক্তিশালী কেবল বানানো সম্ভব হলে স্পেস লিফট মহাকাশ ভ্রমন ও গবেষণায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিবে।

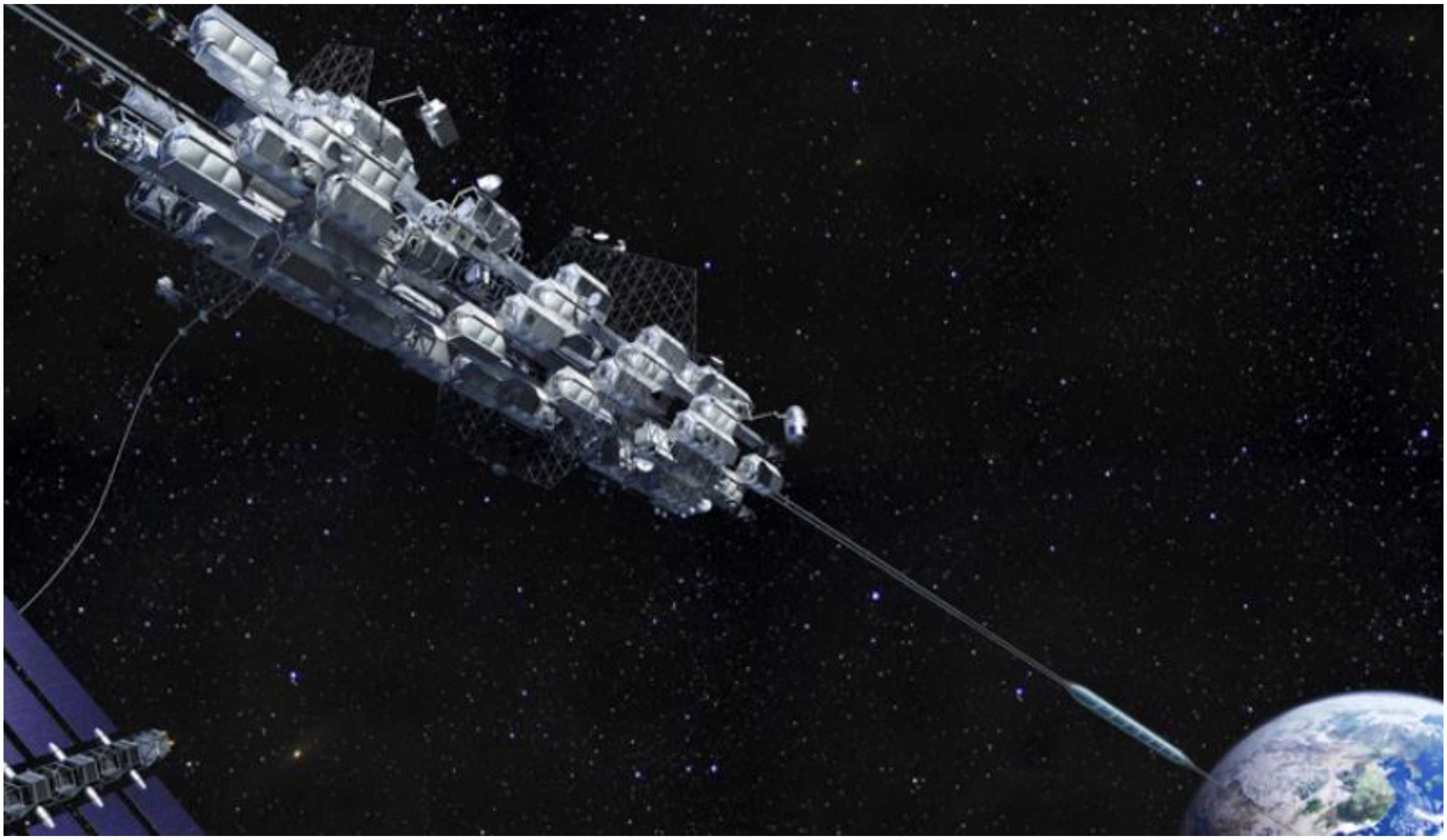

ন্যানোপ্রযুক্তি আমাদের জীবন যাত্রাকে আরও সহজ করে তুলতে পারে, ভবিষ্যৎ-কে করতে পারে আরও নিরাপদ। চল্লিশের দশকে আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনিক ট্রানজিটর ও মাইক্রোচিপ ক্রমশ বিকাশের ফলে বর্তমানে একটি ছোট চিপেও ৫ বিলিয়নের বেশি ট্রানজিটর থাকতে পারে। ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে গাড়ির এমন বিকাশ যদি ঘটানো যায় তবে আমরা মাত্র ৩ ডলারে ৩ লক্ষ্য মাইল/ঘন্টা বেগে চালাতে পারব। আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার বিপ্লব ঘটাতে পারে। ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে বানানো পরিধানযোগ্য ফিটনেস প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কেউ নিজের সাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। নিরাপত্তা বেবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে পারে ন্যানোপ্রযুক্তি। নিরাপত্তা জনিত সেন্সর গুলিকে আরও ছোট, আরও শক্তিশালী করতে নতুন উদ্ভাবিত ন্যানম্যাটারিয়াল এবং উতপাদনকৌশল গুলর উপর নির্ভর করে।

জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় ন্যানোপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

লাইটয়েট ন্যান-সংমিশ্রিত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে যানবাহন গুলির অজন হ্রাস করে নির্গমন হ্রাসের মাধ্যমে জ্বালানী খরচ কমানো সম্ভব যা বৈশ্বিক জলবায়ু মোকাবেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া ন্যানো আবরণ বিমানে ব্যবহারের মাধ্যমে বিমানকে আরও মসৃণ,   টানা হ্রাস এবং বিমানের উপকরণগুলিকে বিশেষ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। তাছাড়া ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি তৈরি বৈশ্বিক জলবায়ু মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চিকিৎসা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ন্যানোপ্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের জন্য আকর্ষণীয় সম্ভাবনা রয়েছে। ন্যানোপ্রযুক্তিকে ভালভাবে বুঝার জন্য বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের পাশাপাশি যুবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

ক্যালকুলাস

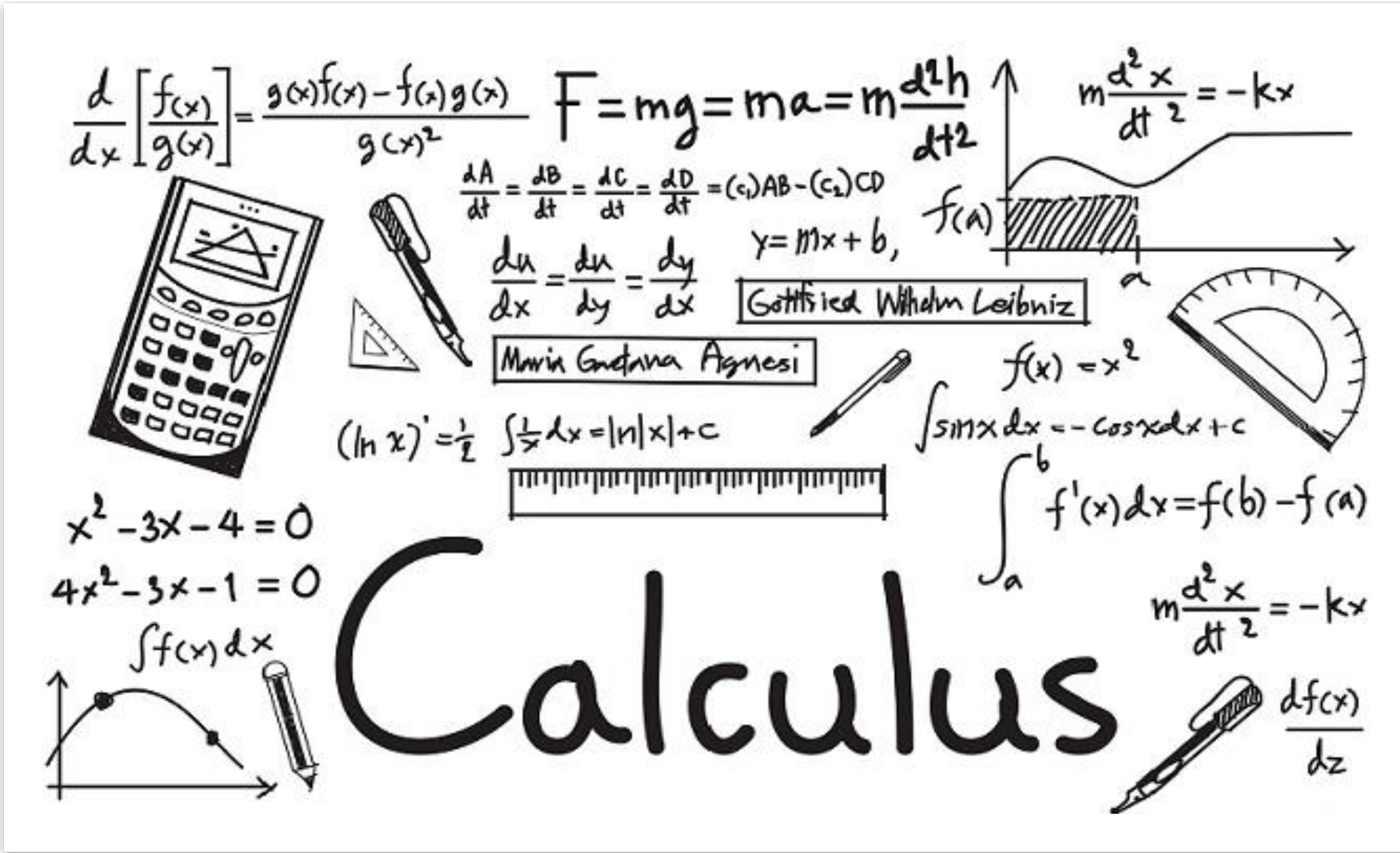

আহমেদ নির্ঝর

ক্যালকুলাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার দ্বারা ছোট নুড়ি পাথর বুঝায়। সতেরো শতাব্দীতে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন এবং গটফ্রিড লাইবনিজ গনিতের এমন একটি শাখা আবিষ্কার করেন যা অবিছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল রাশির পরিবর্তনের তৎক্ষণাৎ হার নিয়ে আলোচনা করে। বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি এবং বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির উপর ক্যালকুলাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়, কম্পিউটার বিজ্ঞানের, পরিসংখ্যানে, প্রকৌশলে, অর্থনীতিতে, ব্যবসায়ে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে সমস্যাকে গানিতিক কাঠামোতে প্রকাশ করা যায় ও সবচেয়ে অনুকুল সমাধান প্রত্যাশা করা যায়।

ক্যালকুলাস প্রধানত দুটি শাখায় বিভক্ত যাদের আমরা অন্তরীকরণ ও যোগজীকরণ নামে জানি। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা ক্যালকুলাসের ধারনা পান। তবে ক্যালকুলাসের বেশিরভাগ ধারনা নিম্নোক্ত দুটি জ্যামিতিক সমস্যা থেকে এসেছে,

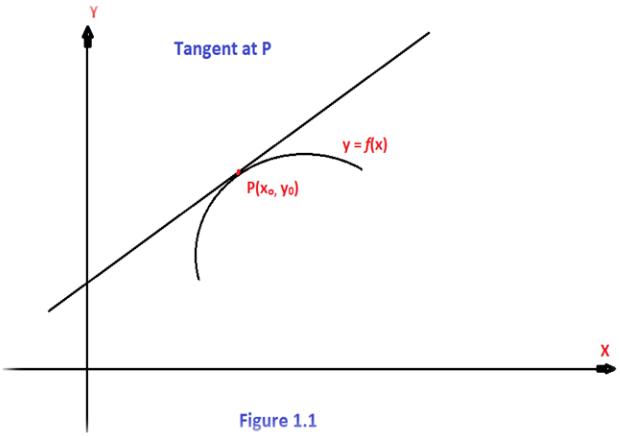

Figure 1.1

১। স্পর্শক রেখা জনিত সমস্যাঃ চিত্র ১.১ এ দেওয়া আছে, একটি ফাংশন f এবং একটি বিন্দু P যা f ফাংশনের উপর অবস্থিত। এমন একটি রেখার সমীকরণ তৈরি করতে হবে যা P বিন্দুর উপর স্পর্শক।

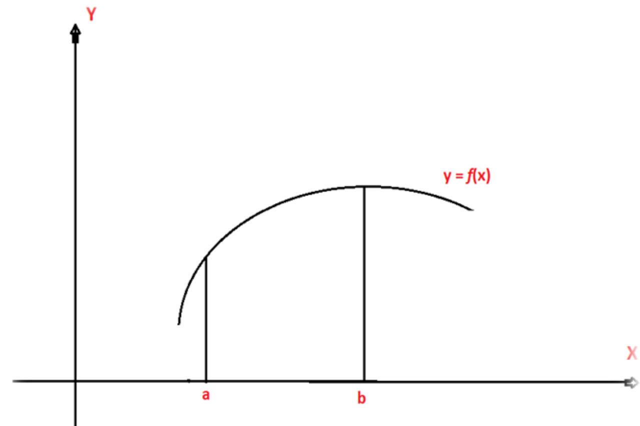

Figure 1.2

২। ক্ষেত্রফল জনিত সমস্যাঃ চিত্র ১.২ এ দেওয়া আছে, একটি ফাংশন f , ফাংশনটির a ও b রেখা দ্বারা ছেদকৃত মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

মূলত প্রথম সমস্যাটি থেকে অন্তরীকরণ ও দ্বিতীয় সমস্যাটি থেকে যোগজীকরণের উৎপত্তি।

স্পর্শক রেখা এবং সীমাঃ

Figure 1.3

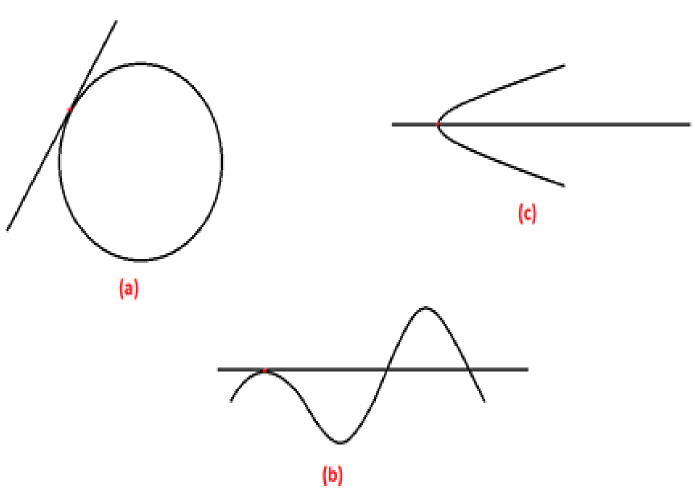

সমতল জ্যামিতিতে একটি রেখাকে শুধুমাত্র তখনই স্পর্শক বলা যাবে যখন রেখাটি কোন বৃত্তের শুধু একটি বিন্দুকে স্পর্শ করে (চিত্র ১.৩ (a)) । যদিও এই সংজ্ঞাটি শুধু বৃত্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এটি সকল বক্ররেখার জন্য প্রযোজ্য নয়। উদাহরন স্বরূপ, চিত্র ১.৩ (b) এ রেখাটি বক্ররেখাটিকে শুধুমাত্র একবার স্পর্শ করলেও এটিকে স্পর্শক বলা যাবেনা আবার চিত্র ১.৩ (c) এর ক্ষেত্রে রেখাটি বক্ররেখাটিকে স্পর্শক রেখার মত স্পর্শ করে, তবুও এটি বক্ররেখাটিকে একের অধিকবার স্পর্শ করে।

তাই একটি স্পর্শক কি তা বুঝতে হলে আমাদের অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। ধরা যাক, xy- সমতলে একটি বক্ররেখার উপর P একটি বিন্দু যার উপর স্পর্শক রেখা অঙ্কন করতে হবে, Q অপর একটি বিন্দু যা একই বক্ররেখার উপর অবস্থিত এবং P থেকে ভিন্ন। P ও Q বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত রেখাকে বক্ররেখাটির ছেদকরেখা বলে। যদি আমরা Q বিন্দুটিকে বক্ররেখার উপরদিয়ে P বিন্দুর কাছাকাছি আনতে থাকি তাহলে PQ ছেদকরেখাটি চক্রাকারে P এর কাছাকাছি আসতে থাকবে। একসময় PQ রেখাটি শুধু মাত্র P বিন্দুগামী হবে, তখন P বিন্দুগামী রেখাটিকে P বিন্দুতে বক্ররেখার স্পর্শক রেখা বলা যাবে (চিত্র ১.৪ (a)) । ঠিক এভাবেই চিত্র ১.৪ (b) তে বৃত্তের ক্ষেত্রে স্পর্শক রেখার বর্ণনা করা হয়েছে।

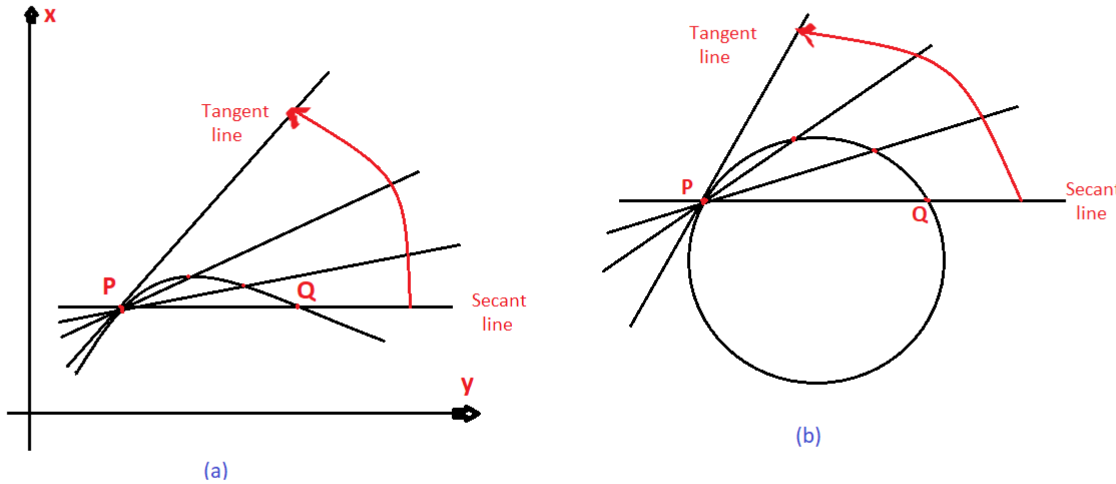

Figure 1.4

উদাহরন ১: $y=x^2$ পরাবৃত্তটির P (1,1) বিন্দুতে স্পর্শক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

সমাধানঃ ধরা যাক, P বিন্দুতে স্পর্শক রেখার ঢাল mtan, অতএব স্পর্শক রেখার সমীকরণ,

$$Y-1 = m_{tan}(x-1) \quad \text{.............................} \ (১)$$

ঢাল mtan এর মান নির্ণয়ের জন্য একটি ছেদক রেখা নির্ণয় করতে হবে যা P ও Q(x, x2) বিন্দুতে পরাবৃত্তটিকে ছেদ করে। অতএব রেখাটির ঢাল msec রেখাটির সমীকরণ,

$$m_{sec} = \frac{x^2-1}{x-1} \quad \text{..........................} \ (২)$$

চিত্র ১.৪ (a) তে বলা হয়েছিলো, Q বিন্দুটি যদি P বিন্দুর খুব নিকটবর্তী হতে থাকে তাহলে PQ ছেদক রেখাটি ধীরে ধীরে P বিন্দুতে অবস্থিত স্পর্শক রেখার নিকটবর্তী হবে। এতে বুঝায় msec এর মানও mtan এর নিকটবর্তী হতে থাকবে। যাইহোক Q (x, x2) বিন্দু P (1,1) বিন্দুর নিকটবর্তী হওয়াকে বীজগাণিতিক ভাবে x এর মান 1 এর খুব নিকটবর্তী বলা যায়। (কিন্তু $x \neq 1$ কারন P বিন্দু Q বিন্দু থেকে পৃথক)

অতএব, সমীকরণ (২) কে লেখা যায়,

$$M_{sec} = \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$= \frac{(x-1)\,(x+1)}{(x-1)}$$

$$= (x+1)$$

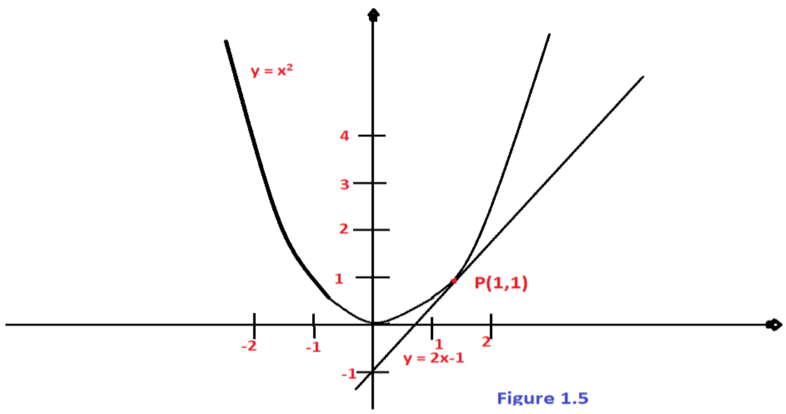

Figure 1.5

এখানে হর ও লব থেকে (x-1) বাদ দেওয়া যাবে কারন উপরক্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে $x \neq 1$। অতএব বুঝা যায় x যত 1 এর নিকটবর্তী হবে ততই msec এর মান 2 এর নিকটবর্তী হবে। তাই বলা যায় mtan = 2, ১ নং সমীকরণে mtan এর মান বসিয়ে পাই,

$$y-1= 2\,(x-1)$$

অথবা, $y = 2x-1$

চিত্র ১.৫ এ $y=x^2$ এর লেখচিত্র দেখানো হল।

ক্ষেত্রফল এবং সীমাঃ

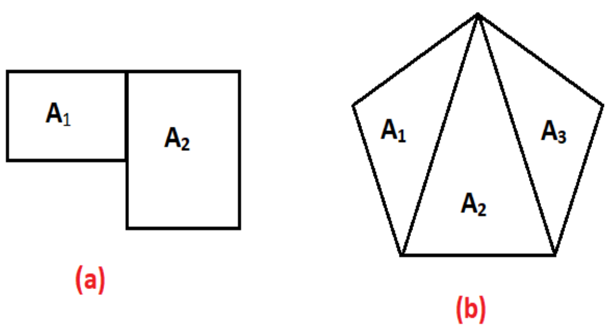

Figure 1.6

পূর্ববর্তী স্পর্শক রেখার ধারনা থেকে আমরা সীমা বা লিমিট সম্পর্কে জানতে পারি যা ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রেও একই। সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমরা স্থানটিকে ত্রিভুজ অথবা চতুর্ভুজে ভাগ করে এদের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি (চিত্র ১.৬) । কিন্তু চিত্র ১.৭ (a) এর মত বক্ররেখায় আবদ্ধ ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এখানে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে আবদ্ধ ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট সংখ্যক চতুর্ভুজে ভাগ করা যায়না, এতে কিছু স্থান ফাকা থাকে (চিত্র ১.৭ (b))। তাই আমরা যদি চতুর্ভুজ সংখ্যা বৃদ্ধি করি তাহলে চতুর্ভুজগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের নিকটবর্তী হতে থাকবে (চিত্র ১.৭ (c)) । এতে বুঝায় এখানেও আমরা সবচেয়ে নিকটবর্তী সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি যাকে পরবর্তীতে যোগজীকরণ নামকরণ করা হয়।

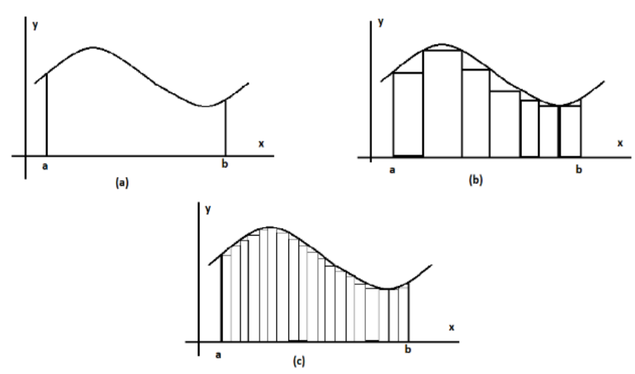

Figure 1.7

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

সি প্রোগ্রামিং: পাঠ শূণ্য

মো: আশিকুর রহমান আসিফ

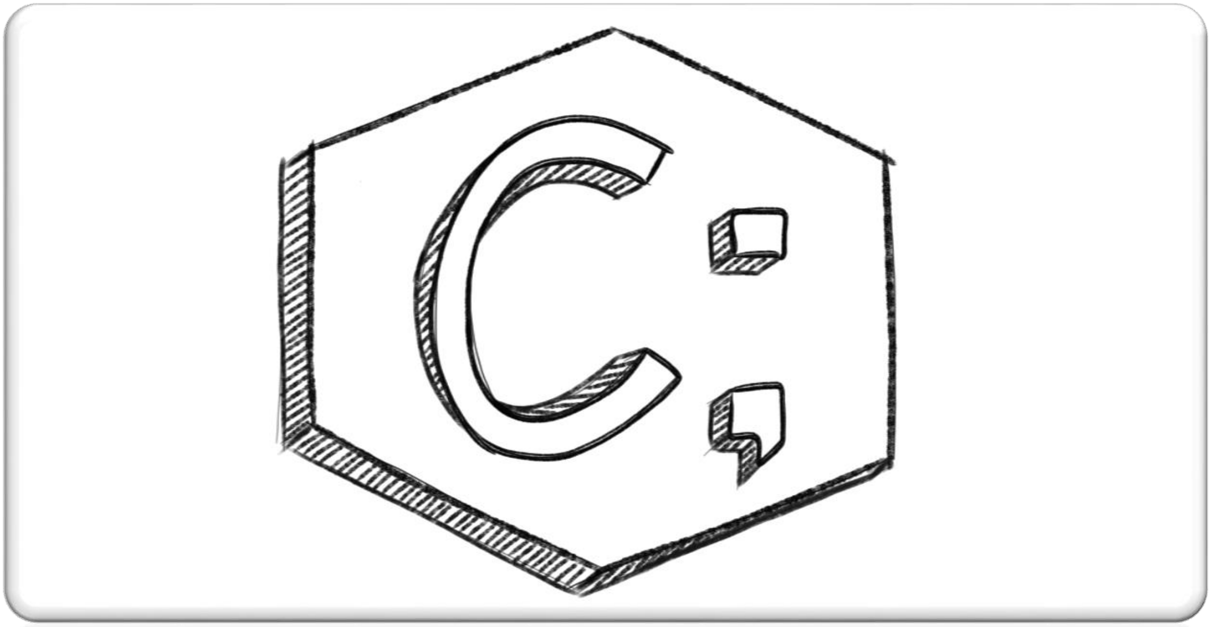

প্রথমদিকে সি (C) শুধুমাত্র সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করতে ব্যবহার করা হতো। সিস্টেম সফটওয়্যার হলো একধরণের প্রোগ্রাম যাদের মূল কাজ হলো কম্পিউটারকে চলতে সাহায্য করা। এদের মধ্যে আছে যেমন, অপারেটিং সিস্টেম, কম্পাইলার, এবং এডিটর প্রোগ্রামসমূহ। এর পরবর্তীতে, সি যখন জনপ্রিয় হতে শুরু করে, তখন এটি একটি সাধারণ ব্যবহার্য বা সর্বজনীন ভাষার রূপ লাভ করে। বর্তমানে, যেকোনো কৃত্রিম প্রোগ্রামিং টাস্ক পূরণ করতে প্রোগ্রামাররা সি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এটি সেই ভাষা যেটি তার সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হয়ে আজ এ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে তার বহুমুখীতার প্রমাণ করে যাচ্ছে।

সি (C) কী?

সি একটি স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ভাষা (Structured Programming Language) যেটি ১৯৭০ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের Bell Laboratory-তে Dennis Ritchie UNIX operating system-এ উদ্ভাবন ও সর্বপ্রথমবারের মতো প্রয়োগ করেন। মূলত, সি এর উৎপত্তি হয় BCPL নামক আরও একটি পুরোনো কম্পিউটার ভাষার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল থেকে যা ডেভেলপ করেন Martin Richards।

পরবর্তীকালে, BCPL থেকে B নামে আর একটি ভাষার উন্নতি হয় যার উদ্ভাবক হলেন Ken Thompson, এবং এ ভাষার পরবর্তী উন্নয়নের ফলশ্রুতিতেই সি প্রোগ্রামিং ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

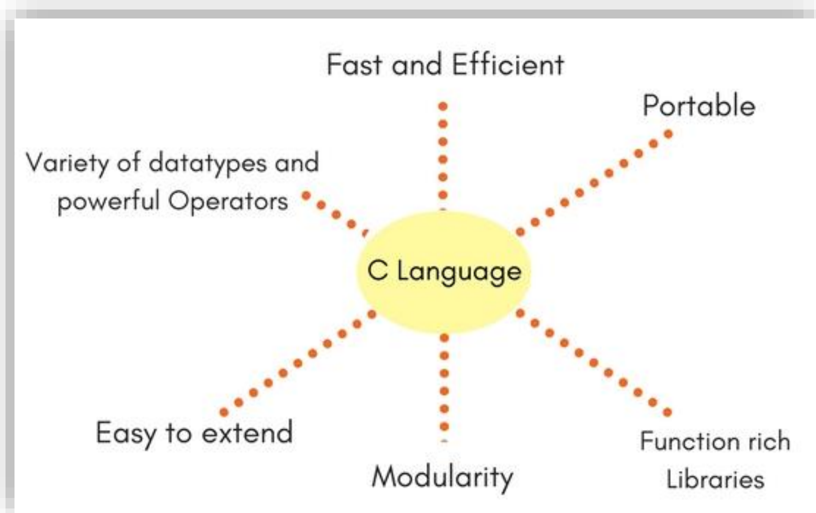

দীর্ঘ সময়ের জন্য সি এর স্ট্যান্ডার্ড (*de facto standard*) বা আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় Brian Kernighan ও Dennis Ritchie রচিত *The C Programming Language* (Prentice-Hall, 1978) বইটিকে। সে সময়ে মাইক্রো কম্পিউটারে সি এর ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে সি প্রোগ্রামিং ভাষাও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় সি এর Library Function-গুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ১৯৮৩ একটি কমিটি গঠন করে ANSI (American National বছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সি এর জন্য একটি আদর্শ মান Standards Institute)-এরপ্রতিষ্ঠা করা হয়, যারা তাদের নির্ধারণ করতে সক্ষম হন।

সি কে সাধারণত একটি মধ্যস্তরের ভাষা (middle-level language) হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এর পূর্বে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করার জন্য মাত্র দুই ধরণের ভাষার প্রচলন ছিল, তন্মোধ্যে এটি হলো অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)। এটি ছিল একটি নিম্নস্তরের ভাষা, এবং এর সাহায্যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই দূরহ ছিল। এসময় অ্যাসেম্বলির চেয়েও উন্নত এবং তুলনামূলক সহজ একটি কম্পিউটার ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং যার স্থান পূরণ করে সি প্রোগ্রামিং ভাষা। যদিও এটি Python, BASIC বা Pascal এর মতো উচ্চস্তরের ভাষা নয় কিন্তু সি উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের ভাষার মধ্যে এটি ভারসাম্য প্রদান করতে সক্ষম হয় ও সল্প সময়েই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রাথমিকভাবে, প্রধানত সিস্টেম সফটওয়্যার (System software) তৈরি করতে সি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি একটি সাধারণ ব্যবহার্য প্রোগ্রামিং ভাষায় (general purpose programming language) পরিণত হয় এবং বর্তমানে এটি যেকোনো ধরণের প্রোগ্রামিং টাস্ক (task) পূরণ করতে সক্ষম।

কম্পাইলার (Compiler)

আমরা জানি, কম্পিউটার সবসময় মেশিন ভাষায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মেশিন ভাষা কী? মেশিন

ভাষা (Machine Language) হলো শূণ্য(০) আর এক(১)-এর সমন্বয়ে তৈরি কম্পিউটারের বোধগম্য একমাত্র ভাষা, যাকে আমরা বাইনারি কোড (Binary Code) বা ব্যবহারিকভাবে 0 এবং 1 পরিচয়ে জানি। ত এখন প্রশ্ন হলো, সি ভাষায় আমরা কোনো প্রোগ্রাম বা সোর্স কোড (Source Code) লিখলে তা কম্পিউটার কিভাবে বুঝতে পারে? কম্পিউটার ত মেশিন ভাষা ছাড়া আর কিছু জানেই না। কম্পিউটারকে আমাদের এই সোর্স কোডটা বোঝাতে হলে আমাদের একটি অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন যা আমাদের লেখা উক্ত সোর্স কোডটিকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে কম্পিউটারের বোধগম্য করে তুলবে। এই অনুবাদকের কাজটি করে থাকে কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)।

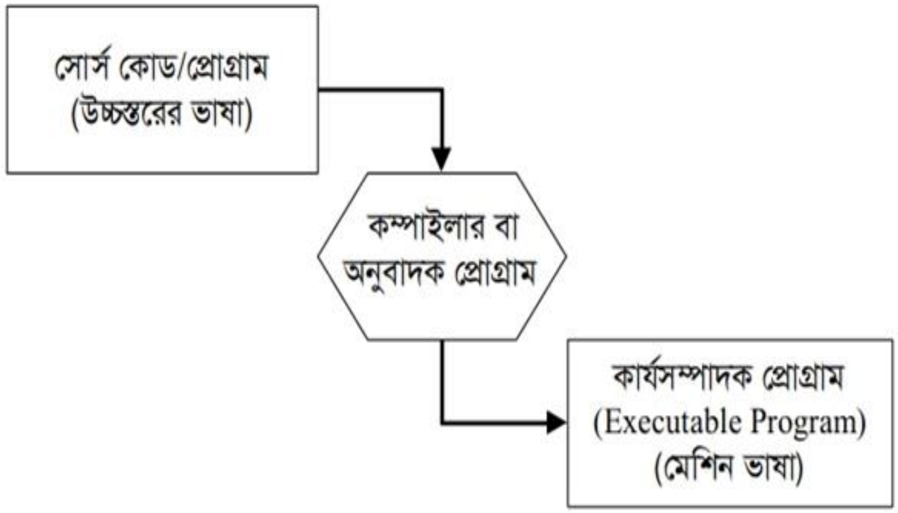

এখানে কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে, সম্পূর্ণ সোর্স কোডটি প্রথমে পড়ে তাতে কোনো ভুল না থাকলে সরাসরি মেশিন কোড বা অবজেক্ট কোডে (Object Code) রূপান্তরিত করা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী ফাইল যুক্ত করে চূড়ান্ত ফলাফল দেখানো। এক্ষেত্রে পরবর্তী যতবার অপরিবর্তিত অবস্থায় সোর্স কোডটি চালানো (Run) হবে, ততবারই এর অনুবাদকৃত মেশিন কোডটি কোনো সাহায্যকারী প্রোগ্রাম ছাড়াই অপারেটিং সিস্টেম থেকে সরাসরি কাজ করবে।

অন্যদিকে, ইন্টারপ্রেটার সম্পূর্ণ সোর্স কোডটিকে মেশিন কোডে পরিবর্তন না করেই একলাইন একলাইন করে প্রোগ্রামের নির্দেশনাসমূহ এক্সিকিউট করে। যার কারণে এটি কম্পাইলারের তুলনায় ধীরগতিতে কাজ করে এবং উক্ত সোর্স কোডটি সহজে পরিবহনযোগ্য হয় না। তবে কম্পাইলকৃত Executable file (.exe) সহজে স্থানান্তরযোগ্য হওয়ায় কম্পাইলড ল্যাংগুয়েজ যেমন সি অন্যান্য ইন্টারপ্রেটেড ল্যাংগুয়েজের তুলনায় অত্যধিক জনপ্রিয়।

মেমোরি (Memory)

সি প্রোগ্রামিং-কে গভীরভাবে বুঝতে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে আমাদের প্রথমেই কম্পিউটারের মেমোরি কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় ধারণা রাখা জরুরি। তবে, শুরু করা যাক।

আমরা জানি, কম্পিউটারের মূল অংশ পাঁচটি। এগুলো হলো, প্রসেসর (Processor), মেমোরি (Memory), ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস (Input/Output device) বা সংক্ষেপে I/O device, ডাটা স্টোরেজ (Data storage), এবং প্রোগ্রাম (Program)। এদের মধ্যে কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মেমোরি, যাকে Random Access
Memory বা সংক্ষেপে RAM বলে। যখন কোনো প্রোগ্রাম চালানো হয় তখন প্রসেসর উক্ত প্রোগ্রামের যাবতীয় নির্দেশনা

এবং ডাটা প্রথমেই এই মেমোরিতে নিয়ে আসে। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, মেমোরি কী?

মেমোরি হলো কম্পিউটারের কাজের জন্য নির্ধারিত একটি জায়গা যা কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতি (temporary memory)

হিসেবে কাজ করে। কম্পিউটারের মেমোরি হলো, মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে কম্পিউটার কোনো কাজ (প্রোগ্রাম টাস্ক) সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং ডাটা মূল স্টোরেজ ডিস্ক থেকে পড়ে নিয়ে রাখে এবং উক্ত কাজ সম্পাদনকালীন সময়ে প্রসেসর প্রয়োজন অনুসারে সেই ডাটা ব্যবহার করে। মেমোরিতে এই ডাটাগুলো অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ, যখন টাস্কটি সম্পন্ন হয়ে যাবে, তারপরই মেমোরি থেকে উক্ত টাস্ক সম্পাদন করার জন্য জমাকৃত ডাটাগুলো মুছে যাবে এবং নতুন কোনো টাস্কের ইনপুট নেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে আর পুরোনো টাস্কের আউটপুট আমাদেরকে টাস্ক শেষ (Terminate/kill) করার আগ পর্যন্ত দেখাবে। মেমোরিতে ডাটা সংরক্ষণ এবং তা পড়ার কাজটি (একত্রে Read and write) প্রসেসর এবং I/O ডিভাইস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যে কাজটি প্রসেসর করে থাকে। মেমোরির এসকল ধরণের ডাটা যাচাই করার কোনো ক্ষমতাই নেই। কারণ সকল ধরণের ডাটাই মেমোরির কাছে কেবল '0' এবং '1' এর সমষ্টি।

মেমোরিতে ডাটা সংরক্ষণ

মেমোরিতে সকলপ্রকার ডাটা বিট (bit) এবং বাইট (byte) আকারে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। তাই, মেমোরিতে ডাটা কিভাবে সংরক্ষিত হয় তা জানার পূর্বে আমাদের বিট এবং বাইট সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা জরুরি।

বিট এবং বাইট

আমরা পূর্বে জেনেছি, কম্পিউটার মেশিন ভাষা বা বাইনারি (Binary) পদ্ধতিতে কাজ করে। বাইনারি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত '0' এবং '1'-এ দুটি মৌলিক সংখ্যাকে বলা হয় বিট। বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত এবং সংরক্ষিত সকল ডাটার ক্ষুদ্রতম একক। কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশের ক্ষেত্রে এই দুটি মাত্র বিটকে মাত্র দুই ভাবে উপস্থাপন করা যায়। যার দরুণ সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই সীমাবদ্ধতা দূর করা উদ্দেশ্যে আটটি বিটকে একত্র করে আর একটি ডাটা গণনার একক বাস্তবায়ন করা হয় যাকে বলা হয় বাইট।

বিটকে ডাটা গণনার ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বর্ণনা করা হলেও, গণনার সুবিধার্থে কম্পিউটারে ডাটা গণনার একক হিসেবে সাধারণত বাইটকে ব্যবহার করা হয়। মোট ৮টি বিট একত্রে মিলে ১ বাইট হয়। এই ১ বাইটে বাইনারি সংখ্যা বা বিট যেকোনো ক্রমেই সাজানো থাকতে পারে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১ বাইট (1 byte) = ৮ বিট (8 bit)

1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1

এভাবে সাজাতে থাকলে দেখা যায় ১ বাইটের ৮টি বিট তথা '0' এবং '1'-কে সর্বোচ্চ $২^{৮}$ বা ২৫৬ রকমভাবে সমাবেশ (Combination) করা যায়। এই বৃহৎ সমাবেশ সংখ্যা দ্বারা আমরা কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা (0-9), বিভিন্ন অক্ষর (a-z, A-Z, @, #, %,...) সমূহকে প্রত্যেকের আলাদা পরিচয়ে প্রকাশ ও ব্যবহার করতে পারি। বাইটের প্রতিটি গঠনকে একেকটি ক্যারেক্টার কোড (Character Code) বলে। আর এই কোডগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কর্তৃক প্রতিটি অক্ষর বা সংখ্যা বা ক্যারেক্টারের জন্য আলাদা একটি আদর্শ মান (০-২৫৫) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যা প্রত্যেকটি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অভিন্ন থাকে

(বিশেষত ০-১২৭ মান)। বিষয়টিকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

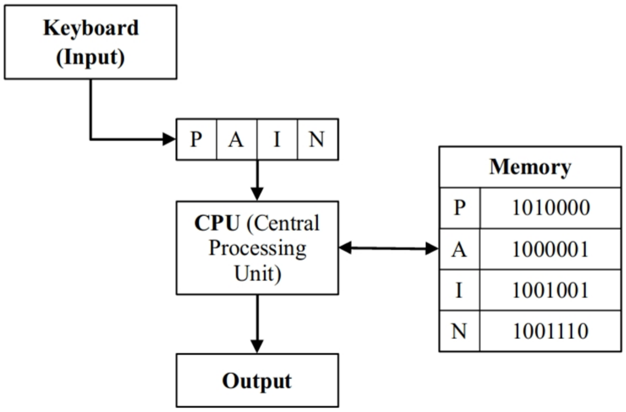

আমরা যখন কী-বোর্ডে যেকোনো কী (এক্ষেত্রে PAIN) চাপ দিই, তখন কী-বোর্ড সেই ক্যারেক্টারগুলোর অ্যাসকি (ASCII) মান প্রসেসরকে পাঠায় এবং প্রসেসর এনকোডারের (Encoder) সাহায্যে সেই ডেসিমেল সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় পরিণত করে এবং প্রসেসর একেকটি ক্যারেক্টারকে একেকটি বাইট আকারে কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষণ করে। এরপর তা আবার ডিকোড (Decode) করে ভিডিও অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে উক্ত ক্যারেক্টারগুলো মনিটরে দেখায়।মেমোরি এ ডাটা ধারণ ক্ষমতা ব্যবহারকারীর ও কম্পিউটারের কাজের প্রয়োজনে ৮ বিট বা ১ বাইট থেকে ১ টেরাবাইট (1 Tb) বা তারও অনেকগুণ বেশি হতে পারে।

মেমোরি অ্যাড্রেস (Memory Address)

কম্পিউটারের মেমোরি হলো সেমিকন্ডার নির্মিত ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস। এটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সেল (Cell) বা কুঠুরি বা খোপ নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি সেলের ধারণ ক্ষমতা ৮ বিট বা ১ বাইট।

মেমোরির প্রতিটি সেলের জন্য নির্দিষ্ট ক্রমিক নাম্বর থাকে। এই সেল শনাক্তকারী নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বরকে মেমোরি অ্যাড্রেস বলা হয়। মেমোরি অ্যাড্রেস সর্বদা শূণ্য থেকে শুরু হয়। যেহেতু প্রতিটি সেলের ডাটা ধারণ ক্ষমতা ১ বাইট; তাই যদি উক্ত মেমোরির মোট ডাটা ধারণ ক্ষমতা ১ কিলোবাইট (Kb) হয়, তাহলে উক্ত মেমোরি অ্যাড্রেস সংখ্যা হবে ১০২৪ টি [১ কিলোবাইট (Kb) = ১০২৪ বাইট (b)]।

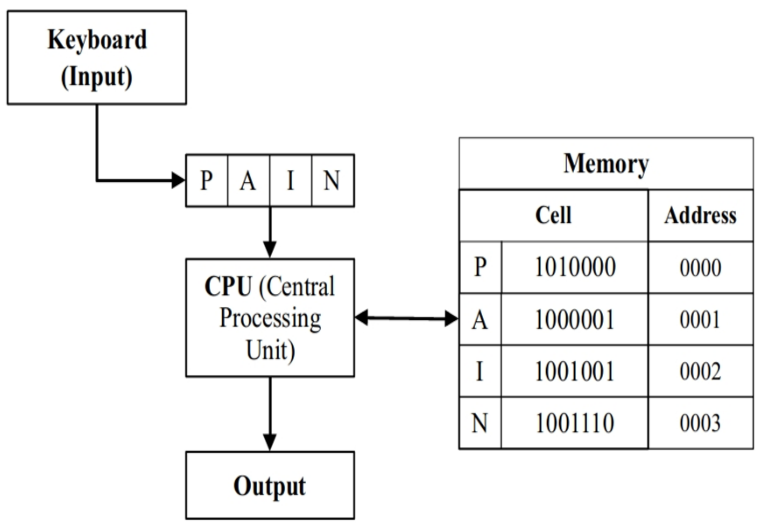

সাধারণত মেমোরিতে ডাটাসমূহ মেমোরি অ্যাড্রেসের ক্রমিক নম্বর অনুসারে আদান-প্রদান হয়। তবে প্রসেসর চাইলে তার সুবিধামতো মেমোরির যেকোনো জায়গায় ডাটা সংরক্ষণ করতে (Save), মুছতে (Erase) ও শনাক্ত (Identify) করতে পারে। পরের সংখ্যায় আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ের কিছু ব্যাসিক নিয়ে আলোচনা করবো।

কুইজ!

১. একটা পোকা একটি ২৫ মিটারের একটি বিল্ডিংয়ের দেয়াল বেয়ে উঠছে। সে দিনের বেলা সারাদিনে ৩ মিটার করে ওঠে। কিন্তু রাতের বেলা ২ মিটার নেমে যায়। সে কততম দিনে দেয়ালের উপরে পৌঁছাবে?

২. নিউরনে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকলে আমাদের উপর তার কি প্রভাব পড়ত?

৩. সুডোকু:

2	9		7			8	1	6
5	7		8	4		9		
3	6		1	2			4	
					5		7	
4			9	1			2	3
	1		2	3	4	6		8
6		2				3		
		7					6	4
			3			2	5	7

৪. একটি ছেলে একটি ধাতব দন্ড বা রডকে আড়াআড়িভাবে রেখে একদম সোজা একটি রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে কারণে দণ্ডে তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল (EMF) তৈরি হল। দণ্ডের এক পাশ (+) চার্জ এবং অন্যপাশ (-) চার্জযুক্ত হল। এখন দণ্ডের দুপ্রান্তে তারযুক্ত করলে কারেন্ট কোনদিকে যাবে?

৬. আমাদের চোখ সবুজাভ হলুদ রঙে প্রচণ্ড সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও সব রকমের বিপদজনক সংকেতে লাল রঙ কেন ব্যবহৃত হয়?

৭. শব্দজট

				প্রো	১	জো	২
						৩	
বি	৪	৫	৬	ন			
৭							
জ		৮					
৯	১০	য়া					
		জ					
		১১	গু	১২			

সঙ্কেত: ১, ২ => জীবের শ্রেণিবিন্যাস সজ্ক্রান্ত

৪, ৫, ৬ => ম্যাগাজিনের নাম

৭, ৯ => অণুজীব সজ্ক্রান্ত

৯, ১০ => চোখ সজ্ক্রান্ত

৮, ১১ => কোষ সজ্ক্রান্ত

১১, ১২ => মাছ সজ্ক্রান্ত

কুইজে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত একজন পাবে আমাদের পক্ষ থেকে উপহার!

উত্তর প্রদানের জন্য উত্তরগুলো প্রয়োজনীয় সমাধান ও ব্যাখ্যাসহ ইমেইল করতে হবে। ব্যাখ্যাহীন এক কথায় উত্তর লিখলে কম নম্বর দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ইমেইলে চাইলে ওয়ার্ড ফাইল, হাতে লিখে কিংবা টাইপ করে তিনভাবেই উত্তর পাঠানো যাবে। ইমেইলে আপনার পূর্ণ নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেশন, ব্যাচ, শ্রেণি/বর্ষ, মোবাইল নম্বর, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক ইত্যাদি তথ্য পাঠাতে হবে।

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ: জানুয়ারি ৫, ২০২০

উত্তরের যথার্থতা, ব্যাখ্যার গুরুত্ব ও ধরনের উপর নির্ভর করে নম্বর দেয়া হবে এবং বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। উত্তর পাঠানোর ইমেইল অ্যাড্রেস: quiz@bigganangon.shikkhaweb.com

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

অনিশ্চয়তা

মোঃ শহিদুল্লাহ

বিজ্ঞান যা বলে, সবই সঠিক। একদম নিশ্চিত কথা। তাই না?কিন্তু বিজ্ঞান কি সবসময় সব কিছু নিশ্চিতভাবে বলতে পারে ? না। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান কিন্ত সব কিছু নিশ্চিত করে বলে না। আমরা যেকোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করলে এভাবে বলিঃ"এটি হবে" অথবা "এটি বা ঘটনাটি হবে না"। কিন্তু আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে এভাবে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। আমরা যেখানে "হবে " বা "হবেনা" বলি, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে সে টিকে বলে "হতে পারে"। চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী আমরা প্রায় সব কিছু নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি। নিউটনের সুত্র আর গতির কিছু সমীকরণ ব্যবহার করে সহজেই আমরা কোন গতিশীল বস্তুর বেগ, সরণ, ত্বরণ ইত্যাদি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

চিরায়ত বা নিউটনীয় পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে যখন প্রকৃতির প্রায় সকল ঘটনাই ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল তখন অনেকেই ভেবে ছিলেন হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যেই পদার্থ বিজ্ঞানের সকল বিষয় আমাদের জানা হয়ে যাবে। এবং পদার্থ বিজ্ঞানের সমাপ্তি হবে। কিন্তু না, তাদের ভাবনা ভুল ছিল। সমাপ্তি না। বরং বিজ্ঞানের এক নতুন জগতের সামনে পৌঁছে যাই আমরা। এক নতুন, বিশাল, রহস্যময় জগত কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সামনে। আর এই নতুন জগতে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারি না। কোয়ান্টাম জগতে কোন গতিশীল বস্তুর বেগ নিশ্চিতভাবে বললে তার অবস্থান সম্পর্কে আমরা অনিশ্চিত হয়ে যাই। আবার, অবস্থান নিশ্চিত হলে বেগ অনিশ্চিত হয়ে যায়।

সহজ ভাষায় ধরুন, আপনি একটি বাস বা রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি বাসে উঠবেন। বাসটি যখন স্টেশনের কাছাকাছি আসলো তখন আপনি নিশ্চিত হলেন যে বাসটি এখন আপনার সামনে অবস্থান করেছে। তখন আপনি বাসটির বেগ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানেন না। অর্থাৎ বাসটি কত বেগে বা ভরবেগে আছে আপনি তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। বাসটি কি স্থির নাকি গতিশীল তা আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না। আবার, যদি আপনি বাসটির ভরবেগ বা বেগ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন তখন বাসটি কোথায় অবস্থান করছে তা আপনি জানেন না। অর্থাৎ আপনি একটি বাসের অবস্থান ও বেগ একই সাথে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না। সত্যিই ব্যাপারটা অনেক বেশি কাল্পনিক। তবে, আমাদের বাস্তব জগতে না ঘটলেও কোয়ান্টাম জগতে এমনটাই ঘটে। কিন্তু এই কোয়ান্টাম জগতটাই বা কোথায় ?

কোয়ান্টাম জগত হল অনু পরমাণু দের ক্ষুদ্র জগত। আর সেখানে কোন গতিশীল কণার একই সাথে ভরবেগ ও অবস্থান নিশ্চিত করে বলা যায় না। এটিই অনিশ্চয়তা নীতি।

কোন গতিশীল কণার অবস্থান পরিমাপের অনিশ্চয়তার পরিমান Δx এবং ভরবেগ এর অনিশ্চয়তার পরিমান Δp হলেঃ

$$\Delta x \ \Delta p \ => \ h/4\pi$$

এখানে h হল প্লাঙ্কের ধ্রুবক। আর এর মান হলঃ 6.63*10^-34

এখানে যদি Δx =০ হয় অর্থাৎ অবস্থান পরিমাপের ভুলের পরিমান যদি শূন্য হয় তাহলে Δp সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ একই সাথে কোন কণারই অবস্থান এবং ভরবেগ এর মান ঠিক ভাবে বলা যায় না। অনু পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতে নিউটনীয় বা চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান কাজ করে না। h এর মানের চেয়ে ক্ষুদ্র এই জগতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়েই সব ব্যাখ্যা করতে হয়। অবস্থান- ভরবেগ এর মত আরো একটি বিষয় আছে যা কোয়ান্টাম মেকানিক্স একই সাথে সুনিশ্চিত ভাবে পরিমাপ করতে দেয় না।তা হল শক্তি ও সময়।

শক্তি-সময়ের অনিশ্চয়তা হলঃ

$$\Delta E \ \Delta t \ => \ h/4\pi$$

সময়-শক্তি অনিশ্চয়তার একটি মজার বিষয় আছে। এখানে ΔE এর মান যত বেশি হবে Δt এর মান তত কম হবে। আবার Δt এর মান যত কম হবে ΔE এর মান তত বেশি হবে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুব অল্প সময়ের জন্য কোন স্থানে শক্তির পরিমানের মধ্যে একটু ভুল হওয়ার অনুমোদন দেয়। সহজ ভাষায়, কোন স্থানে খুবই অল্প সময়ের জন্য আপনাআপনি কিছু শক্তির আবির্ভাব হতে পারে। আর ওই অল্প সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আবার শক্তি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। ব্যাপারটা অনেকটা শক্তির সংরক্ষনশীলতার লঙ্ঘন বলে মনে হলেও কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুব অল্প সময়ের জন্য শক্তির এই উদ্ভবের অনুমোদনটা দেয়।

আমরা অনেকেই হয়তো কখনো না কখনো শুনেছি যে, শূন্যস্থান কখনো শূন্য নয়।আসলে, কোয়ান্টাম থিওরি অনুযায়ী যখন আমরা কোন ফাঁকা স্থানকে দেখি তখন তার অর্থ এই নয় যে স্থান টি একদম শূন্য, কারণ মহা বিশ্বে কোন জায়গা পুরোপুরি খালি থাকা সম্ভব নয়। কারণ যখন আমরা বলি কোন একটা জায়গা ফাঁকা আছে তার অর্থ হল ওই স্থানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র ইত্যাদির মান শূন্য। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রের মান একেবারে শূন্য হয়না। যার অর্থ হল এদের মধ্যে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থাকবেই।

এই কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন আসলে কি? যেকোনো ফাঁকা স্থানে সাধারণত দুটি উপাদান থাকে – ম্যাটার(পদার্থ) ও অ্যান্টি ম্যাটার(প্রতি-পদার্থ)। এদের ভার্চুয়াল কণা বা পার্টিকেলও বলা হয়। ভার্চুয়াল পার্টিকেল বলার অবশ্য অন্যতম একটা কারণ আছে, তা হলঃ এদের সাধারণ পার্টিকেলের মত পার্টিকেল ডিটেক্টর দিয়ে অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যায় না। ফাঁকা স্থানে প্রতিনিয়তই পদার্থ আর প্রতিপদার্থ তৈরী হচ্ছে, আবার নিজেরাই মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কিভাবে এই পদার্থ-প্রতিপদার্থ তৈরী হচ্ছে?পদার্থ তৈরী হতে প্রয়োজনীয় শক্তি কোথায় পাচ্ছে ?

আসলে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সই ওই অল্প সময়ের জন্য শক্তির অনুমোদন দিয়েছে। আর ওই শক্তি থেকেই পদার্থ আর প্রতিপদার্থ তৈরী হচ্ছে, আবার ওই অল্প সময়ের মধ্যেই পদার্থ ও প্রতিপদার্থ গুলো নিজেরাই মিলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে আবার শক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সবাই ব্লাকহোল সম্পর্কে কমবেশি শুনেছি। ব্লাকহোল এর সবচেয়ে সহজ পরিচয় হল এর গ্রাভিটি। ব্লাকহোলের অভিকর্ষ বল অনেক। এমনকি সেখান থেকে আলো পর্যন্তও বের হতে পারে না। যেহেতু, আলো বের হতে পারে না তাহলে ব্লাকহোল একটি সম্পূর্ণ কালো বস্তু হবে বলে মনে হয়। তাই না ?

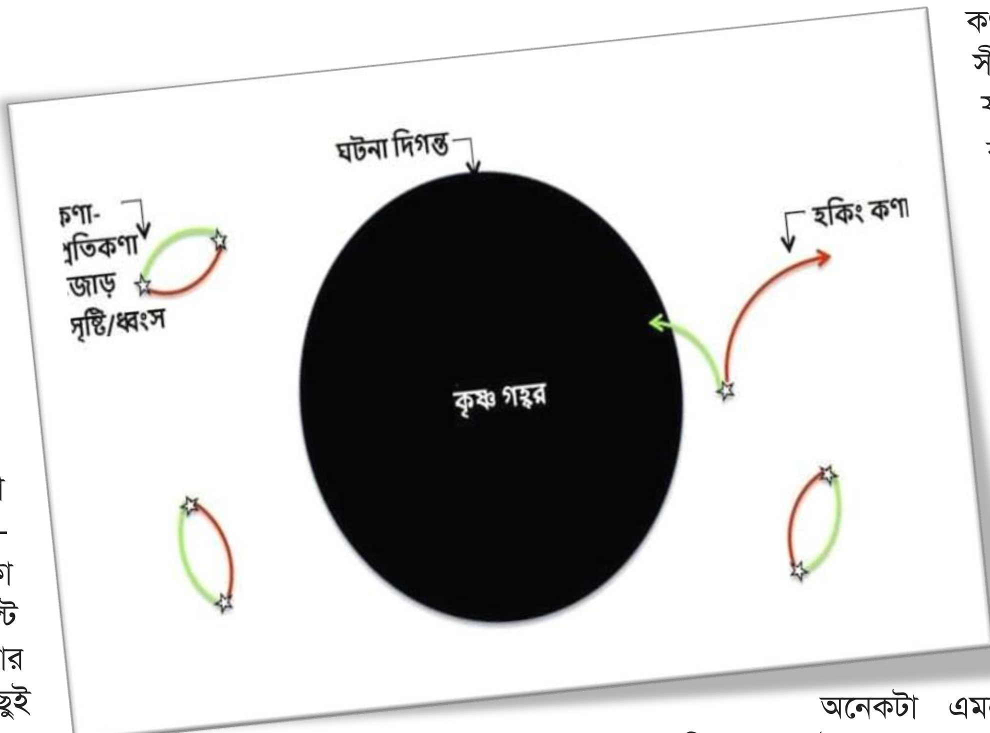

কিন্তু এমনটা নয়। ব্লাকহোল আসলে সম্পূর্ণ কালো নয়। ব্লাকহোলের একটি সীমানা থাকে, যাকে ইভেন্ট হরাইজন বলা হয়। ব্লাকহোল এর অসীম ঘনত্ব বা সিঙ্গুলারিটি ইভেন্ট-হরাইজন দিয়ে ঢাকা থাকে। ইভেন্ট হরাইজন সীমানার বাইরে কোন কিছুই বের হতে পারে না।

এবার একটু ভেবে দেখা যাক যদি এমনটি হয় যে, হরাইজনের খুব কাছে অল্প সময়ের জন্য দুটি কণা তৈরী হলো। এক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে

যে, কণা বা পার্টিকেল দুটি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত হবে।

পার্টিকেল জোড়ের মধ্যে একটার আধান ধনাত্মক ও আরেকটির আধান ঋণাত্মক হবে। পরবর্তীতে এই বিপরীত আধান যুক্ত পার্টিকেল গুলো মিশে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ঋণাত্মক আধান যুক্ত কণাটি হরাইজন সীমানার ভিতর ঢুকে যায়। তাহলে ধনাত্বক কণাটি কিন্তু বাইরেই থাকবে। আর, বাইরে থাকা কণাটি আর হরাইজনের ভিতরে চলে জাওয়া কণা মিলিত হয়ে ধ্বংস হতে পারছে না। তাহলে বাইরে থাকা কণাটি একটি মুক্ত কণাই হয়ে যাবে। কণাটি দেখলে অনেকটা এমন মনে হবে যে, ব্লাকহলের ভিতর থেকেই যেন বের হয়ে যাচ্ছে কণাটি। আর এভাবেই ব্লাকহলের চারপাশ থেকে সামান্য বিকিরণ এর মত হতে পারে, যা ব্লাকহোল কে দূরবর্তী কোন দর্শক এর নিকট সম্পূর্ণ কালো বস্তু হতে দেয় না। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা এই ব্যাপারটিকে হকিং রেডিয়েশন নামেই জানি, যা অনিশ্চয়তা নীতিরই একটি ফলাফল।

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

বই রিভিউ: কোয়ান্টাম মেকানিক্স

লেখক: মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রকাশক: মাওলা ব্রাদার্স

রিভিউয়ার: মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

পদার্থবিজ্ঞান প্রেমীদের জন্য কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান থেকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার বললে ভুল হবে না কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানকে। সেই কোয়ান্টাম জগতকে জানাতে মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' নামক বইটি।

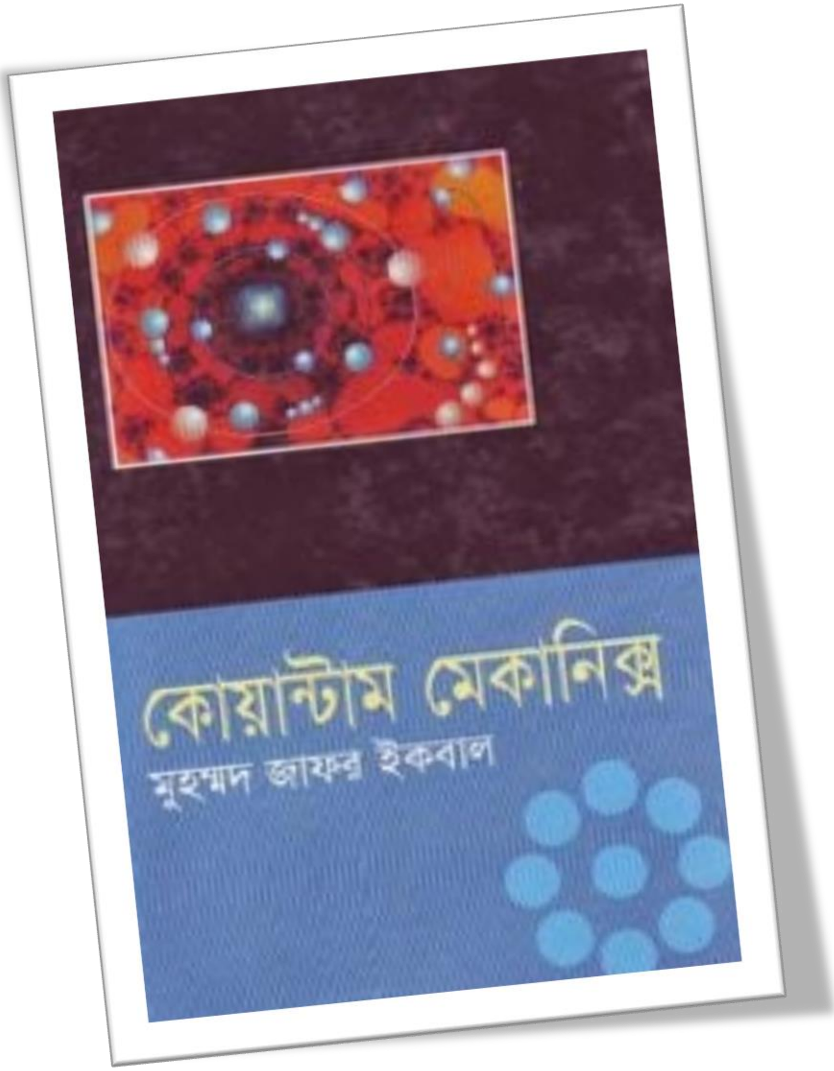

বইয়ের শুরুটা হয়েছে আলো দিয়ে। আলোর কথা বলতে বলতে চলে যান তরঙ্গের ভেতর। আসলে আমাদের এই বিশ্বে তরঙ্গ কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা এই বই পড়লে বুঝতে কারো সমস্যা থাকবে না আর।

এর বাইরেও আমরা প্রত্যেকেই কিভাবে তরঙ্গের গুন নিজেদের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছি সেটাও কিন্তু ভালভাবে বোঝানো হয়েছে। আমরা যে প্রত্যেকেই তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করি, এই সব বিষদ আলোচনা বইয়ে আছে। আশা করছি সকলেরই ভালো লাগবে বইটি।

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

জীবনী: আলবার্ট আইনস্টাইন

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

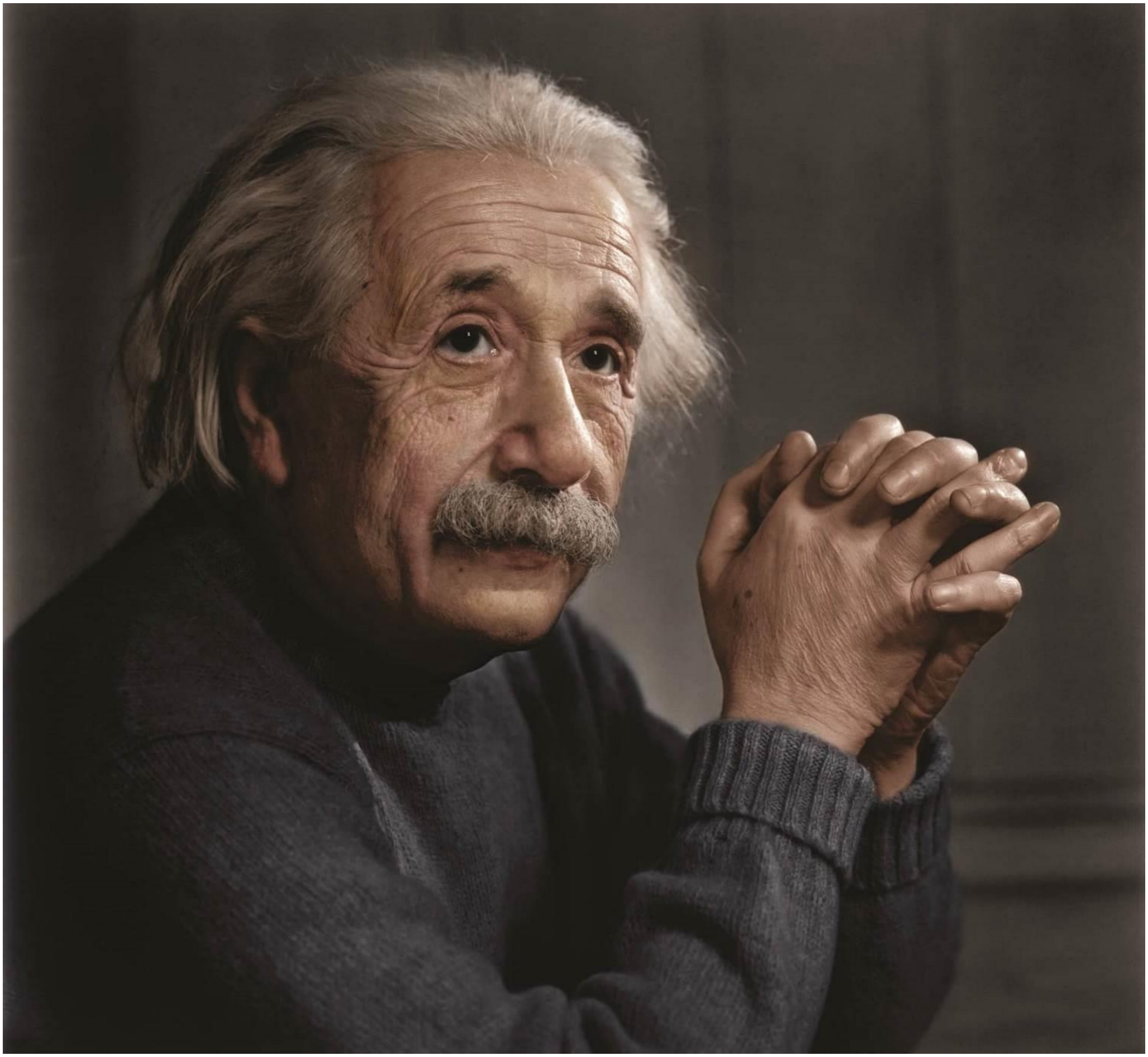

আলবার্ট আইনস্টাইনকে চেনে না এমন লোক খুব অল্প। মূলত আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনাকালে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানকে যে কতটা উঁচুতে নিয়ে গেছেন, তা বলে বোঝানো সম্ভব না। বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন আপেক্ষিকতার যুগান্তকারী দু' টি তত্ত্ব, করেছেন ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক, আবিষ্কার করেন আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কার, একীভূত তত্ত্বের মত চমৎকার বিষয়। আইনস্টাইন আমাদের প্রচলিত নিউটনীয় ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেন। ফলে উচ্চ বেগ সম্পর্কিত বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনীয় গতিবিদ্যা তার কাঠামো থেকে খসে পড়ে একরকম।

সাধারণ আলোচনা

জন্ম	১৪ মার্চ ১৮৭৯ উল্‌ম, উরটেমবার্গ (Württemberg), জার্মানি
মৃত্যু	১৮ এপ্রিল ১৯৫৫ (বয়স ৭৬) প্রিন্সটন, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র
বাসস্থান	জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
নাগরিকত্ব	জার্মান (১৮৭৯-৯৬, ১৯১৪-৩৩) সুইজারল্যান্ডীয় (১৯০১-৫৫) মার্কিন (১৯৪০-৫৫)
কর্মক্ষেত্র	পদার্থবিজ্ঞান
প্রতিষ্ঠান	সুইজারল্যান্ডীয় পেটেন্ট অফিস (বার্ন) জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় চার্লস ইউনিভার্সিটি অফ প্রাগ প্রুশীয় বিজ্ঞান একাডেমি কাইজার ভিলহেল্‌ম ইনস্টিটিউট লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস
প্রাক্তন ছাত্র	ইটিএইচ জুরিখ
পিএইচডি উপদেষ্টা	আলফ্রেড ক্লাইনার

পরিচিতির কারণ	সাধারণ আপেক্ষিকতা বিশেষ আপেক্ষিকতা ব্রাউনীয় গতি আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ভর-শক্তি সমতুল্যতা আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান ইপিআর হেঁয়ালি
উল্লেখযোগ্য পুরস্কার	পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (১৯২১) কপলি মেডেল (১৯২৫) মাক্স প্লাংক পদক (১৯২৯)

পরিচিতি

আইনস্টাইন ছিলেন একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। তবে উনি ওনার কাজের কারণে সবার কাছে যে ' জিনিয়াস' উপাধী পেয়েছেন, তা না বললেও চলে। এই মহান বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ সালে, জার্মানিতে। তবে জার্মানিতে জন্মালেও যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও সুইজারল্যান্ডে তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই কাটে। তিনি জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ড, এই তিন দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব পুরো বিজ্ঞানী জগতে হইচই ফেলে দেয়। এরপর ১৯১৫ সালে অর্থাৎ ১০ বছর পর আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব সকলের সামনে এনে আরেকবার চমকে দিন সবাইকে। উনি কল্পনায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্যই উনি বলেছিলেন,

"কল্পনা, জ্ঞান হতেও উত্তম"

এই মহান বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।

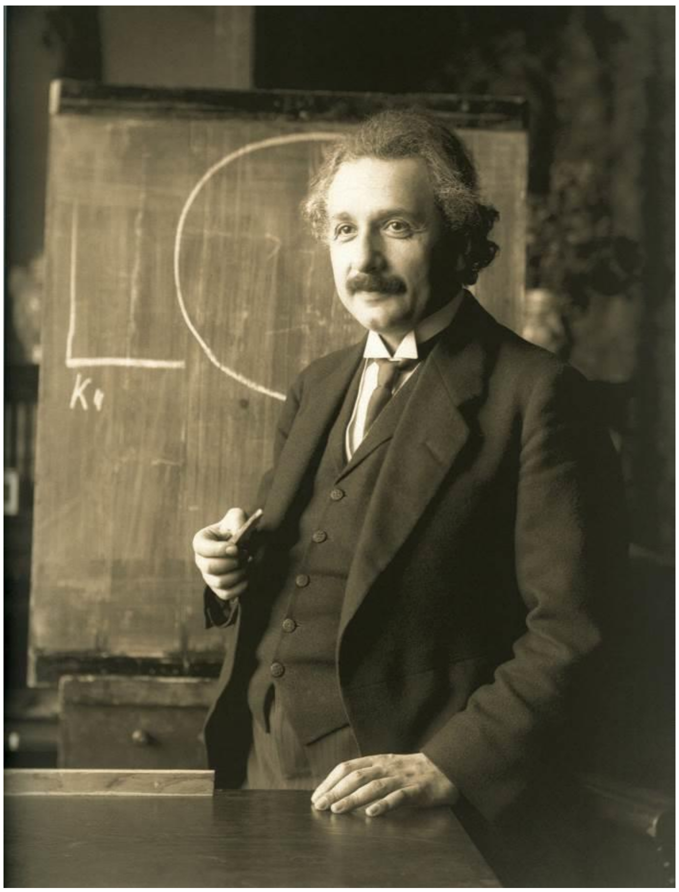

শিক্ষা জীবন

আলবার্ট আইনস্টাইন পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আইনস্টাইন মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় সম্পন্ন করতে পারেন নি। ফলে পরবর্তী ধাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ায় নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। কেননা স্কুল জীবন শেষ না করায় এবং দেশত্যাগ বিষয়ক জটিলতায় তার কোন সার্টিফিকেট ছিল না।

তিনি তখন পরিবারসহ সুইজারল্যান্ডে থাকতেন। তখন তিনি জুরিখের ' সুইজ ফেডারেল পলিটেকনিক্যাল স্কুল (Eidgenössische Polytechnische Schule)' -এ ভর্তি হন। তবে এক্ষেত্রে তাকে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, তাকে মাধ্যমিক পর্যায়ের যেসব ঘাটতি আছে, তা পূরণ করতে হবে মূল পড়াশোনার পাশাপাশি। ঘাটতি দূরীকরণে তাকে সেখানকার একটি স্কুলে পড়তে হয়। তিনি এই পলিটেকনিক্যাল স্কুলে মূলত ম্যাক্সওয়েলের তাড়িতচৌম্বক তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১০০ সালে এখান থেকে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। অবশ্য পরে এই পলিটেকনিক্যাল স্কুলকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়।

এরপরের বছরগুলোতে তিনি গবেষণায় নিজেকে নিয়োগ করেন। এরই মধ্যে তিনি তার বিখ্যাত আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে। একই বছর তিনি ' জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Zürich)' থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা জীবন

১৯০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই তিনি তার ' Annalen der Physik' নামক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর বিষয় ছিল নলের মধ্য দিয়ে কৈশিক বল। সে সময়ই তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। তবে এ গবেষণার কার্যক্রম আরো আগেই বেগবান হতো বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

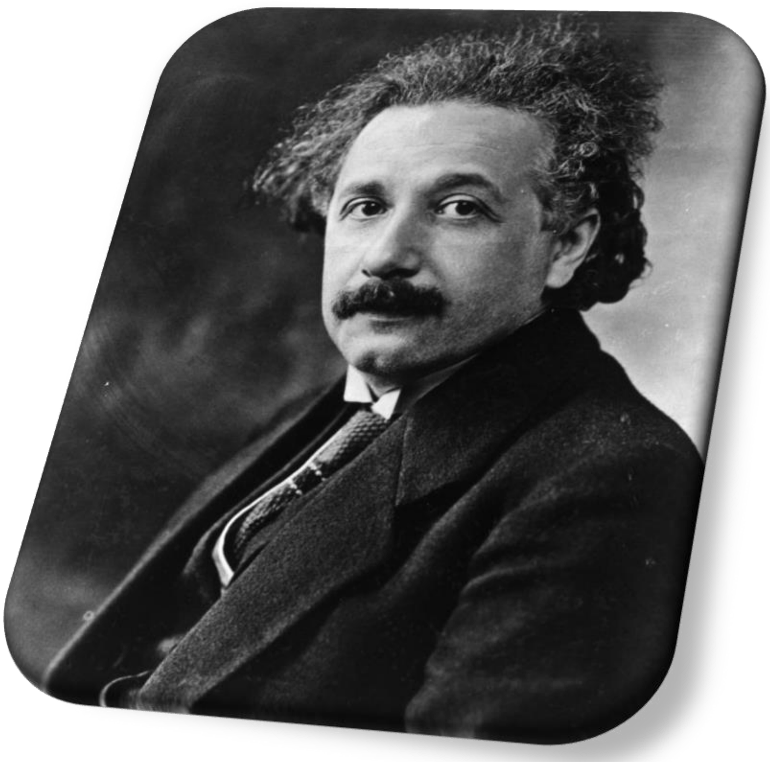

কেননা তিনি স্নাতক শেষে শিক্ষকতার চাকরিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ২ বছর খুঁজেও পান নি। শেষে পেটেন্ট অফিসে চাকরি করেন পরীক্ষক হিসেবে। ফলে পদার্থবিজ্ঞানে তার গবেষণার সুযোগ কমে যায়। পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হতে পারলে সহজেই গবেষণা চালাতে পারতেন।

১৯০৫ সালে পেটেন্ট অফিসে কর্মরত থাকাকলিনই আইনস্টাইন ' Annalen der Physik' নামক এক জার্মান বিজ্ঞান সাময়িকীতে চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। জার্মানির নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রগুলোকে ইতিহাসে ' অ্যানাস মিরাবিলিস গবেষণাপত্রসমূহ' নামে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। কেন স্মরণীয় করা হয়েছে তা গবেষণা পত্রগুলোর নাম শুনলেই আর ব্যাখ্যায় যেতে হবে না। গবেষণাপত্রগুলো ছিল:

১. আলোক তড়িৎ ক্রিয়া: আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ প্রতিপাদন।

২. ব্রাউনীয় গতি: আণবিক তত্ত্বের সমর্থন।

৩. তড়িৎগতিবিজ্ঞান: আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার।

৪. ভর-শক্তি সমতুল্যতা: বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্র প্রতিপাদন।

তবে ভাগ্য একেবারেও খারাপ ছিল না। কেননা ১৯০৮ সালে তিনি পেটেন্ট অফিস ছেড়ে ' বার্ন বিশ্ববিদ্যালয় (University of Bern)-এ প্রভাষক হিসেবে তার শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। ১৯১১ সালে আইনস্টাইন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হন। আবার, এর পরপরই ' চার্লস ইউনিভার্সিটি ইন প্রাগ (Charles University in Prague বা University of Charles)' -এ পূর্ণ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার বদৌলতে তার গবেষণা করুন ধারা পায় এবং একের পর এক গবেষণাপত্র বেরোতে থাকে। নিউটনের বলবিদ্যা তাকে অনেক পীড়া দিচ্ছিল। ফলে তিনি আবিষ্কার করেই ফেললেন বিখ্যাত আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব (Special Theory of Relativity)!

এই ছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। আসলে ওনার কথা বললে তো শেষ হবে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে সাজালাম তার জীবনী।

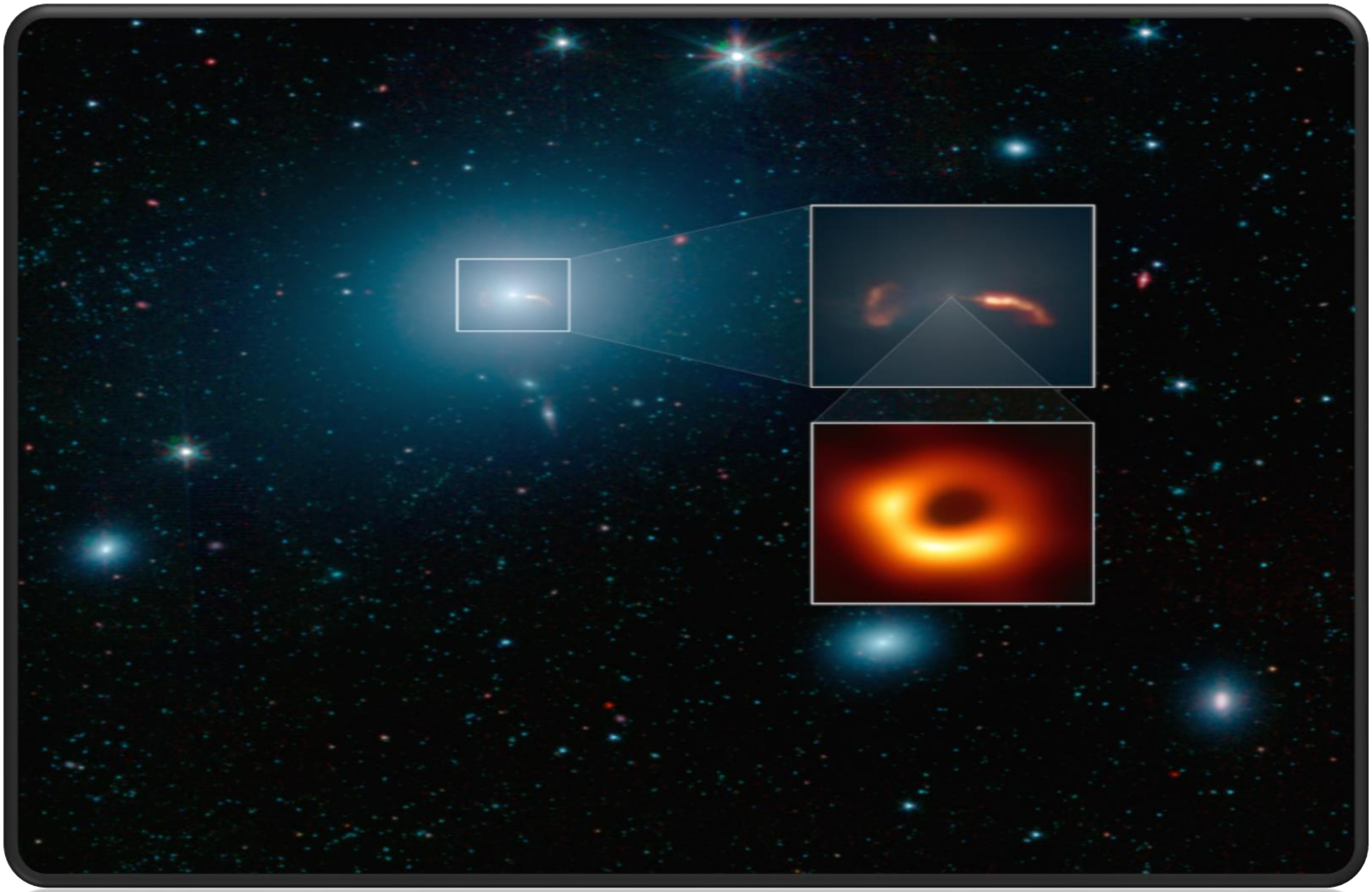

রহস্যময় ব্ল্যাকহোল

ইখতেদার উদ্দিন আকিব

মহা বিশ্ব এক অসীম রহস্য বলয়ে ঘেরা । নানা মতবাদ, সূত্র, তথ্য-পরিসংখ্যান, আচরণ একে দিন কে দিন আরো রহস্যময় করে তুলছে ।বিজ্ঞান যেমন আবিষ্কারের নেশায় ডুব দিয়ে থাকে, তেমন প্রকৃতি বহুগুণে তার রহস্য বর্ধিত করতে থাকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর নানা অংশে তেমনি এক মহাকাশের রহস্য "কৃষ্ণগহ্বর" বা "Black Hole"।

১৭৮৩ সালে নিউটনের সূত্র ব্যবহার করে ইংরেজ ভূ তাত্ত্বিক মিশেল একটি ধারনা দেন-' মহা বিশ্বে এমন শক্তিশালী মহাকর্ষীয় স্থান থাকা সম্ভব যেখান থেকে অন্য কিছু তো নয়ই, এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ স্বয়ং আলো বেরিয়ে আসতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো বস্তুর ঘনত্ব যদি সূর্যের সমান এবং ব্যাসার্ধ যদি ৫০০ গুন হয়, তাহলে ঐ বস্তু পৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগ হবে আলোর দ্রুতির চেয়েও বেশি। সুতরাং আলোকে নিজের দিকে টেনে আনবে, বস্তু থেকে বের হতে পারবে না। তিনি এ বস্তু নাম দেন ' কৃষ্ণ তারা' । কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কোন স্থানের তারা নক্ষত্রের গতি এবং দিক দেখে পাওয়া

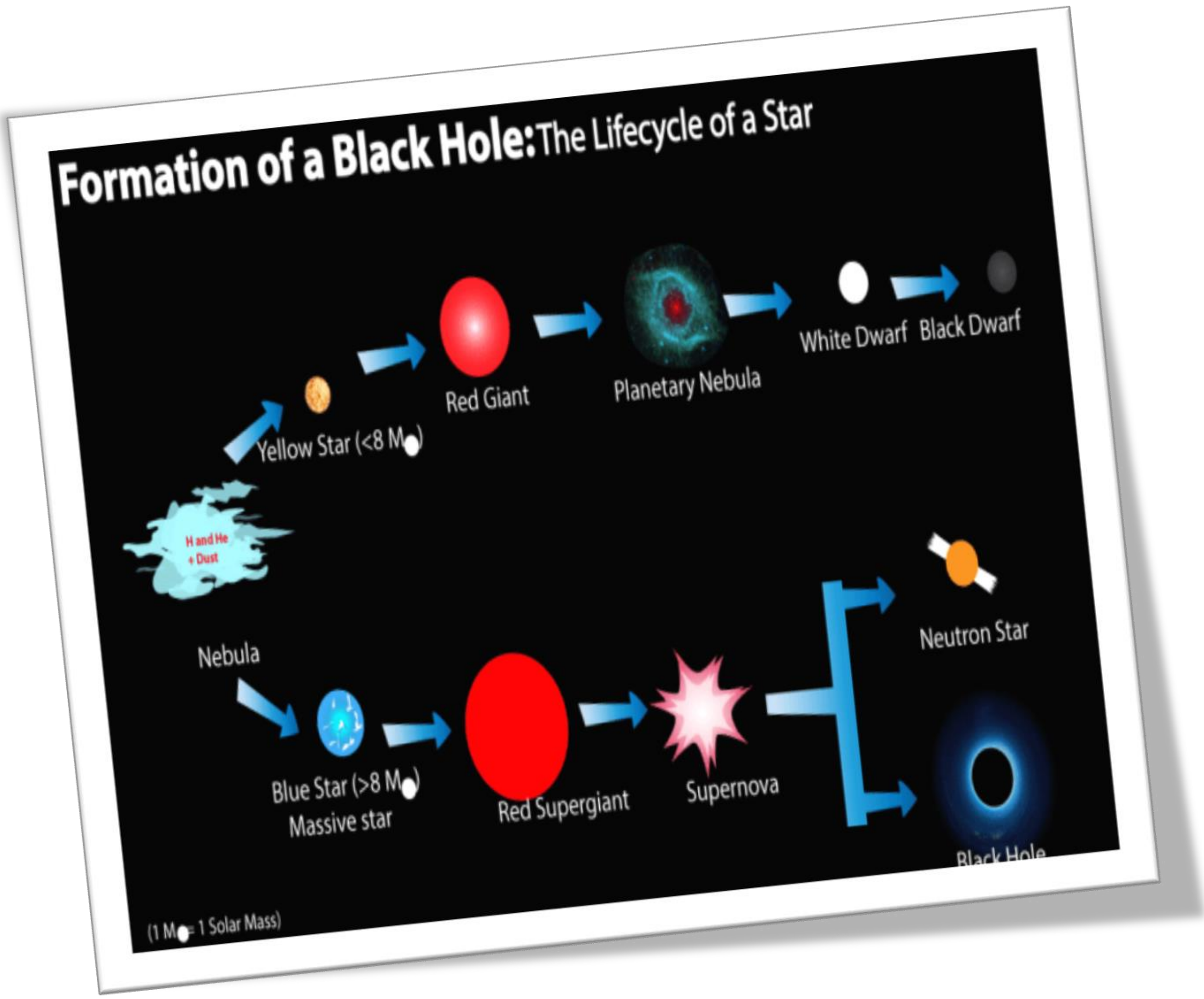

যায়। যেমন-এমন কোনো তারা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যার আলোক কম্পাঙ্ক একটি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। এ ধরনের পরিবর্তন হয় একটি তারা পৃথিবীর দিকে আসে, আবার পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায়। এবং এটি সংগঠিত হয় ডিপলার ক্রিয়ার জন্য। যুগ্ম-তারা ব্যবস্থায় যখন দুইটি তারা যখন একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে তখন এদের বৈশিষ্ট্য হয় এ ধরনের। সেক্ষেত্রে আমরা উভয় তারাই দেখতে সক্ষম। কিন্তু মাঝে-মধ্যে একটি তারা দৃষ্টিগোচর হলেও অপরটি থাকে দৃষ্টি আড়ালের বাইরে। তখন বিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান তারার গতি বিধি পর্যবেক্ষণ করে তার সঙ্গী তারার ভর সহজেই বের করে আনতে পারেন। সেক্ষেত্রে অদৃশ্য তারার ভর যদি তিন সৌরভকে অতিক্রম করে তাহলে তারাটি কৃষ্ণ গহ্বর হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দৃশ্যমান তারাটির বাইরের স্তর একটি অদৃশ্য শক্তির টানে আলোর ফোয়ারা ছিটায়, অর্থাৎ যেদিকে অদৃশ্য শক্তি অবস্থান করে সেদিকে এবং এক্স-রশ্মির নিসঃরণ ঘটায়। এক্স-রশ্মির অভিজ্ঞাপক যন্ত্র বসিয়ে রশ্মির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ১৯৭২ সালে টম বোল্টন তথ্য চরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে সিগনাক্স এক্স-১ নামের তারার সন্ধান পান যার আশেপাশে একটি কৃষ্ণ গহ্বর আছে বলে ধারনা করেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে অতিমাত্রার ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়, যার ভর আমাদের সূর্য থেকে ৪ মিলিয়ন গুন বেশি এবং এটি আমাদের আকাশ গঙ্গার মাঝখানে অবস্থিত। মূলত তারার বিবর্তনেই কৃষ্ণ গহ্বরের সৃষ্টি যা অত্যধিক ভরের তারার সর্বশেষ পরিণতি। তারাদের জীবন কাল একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে দেওয়া। রাতের আকাশের উজ্জ্বলিত তারাগুলো মূলত তাপ কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন শক্তি দ্বারা স্থিরতায় বিদ্যমান এবং সৃষ্ট মহাকর্ষীয় আকর্ষণ হতে পরিত্রাণ পায়। তারার শেষ অবস্থার নির্ধারিত হয় এদের ভরের ওপর। উদাহরণ হিসেবে, সূর্যের মতো মাঝারি ভরের তারাদের পরিণতি হবে শ্বেত বামনে। সূর্যের তুলনায় বেশি ভরের তারারা নিউট্রন তারায় স্থির হয়ে যাবে এবং আর কিছুর পরিণতি হবে কৃষ্ণ গহ্বরে, অর্থাৎ নক্ষত্রের সমস্ত ভর একটি বিন্দুতে একীভূত হয়। কৃষ্ণ গহ্বর হতে হলে তারাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হতে হয়। ১৯১৬ সালে পদার্থ বিজ্ঞানী Karl Schwarzschild, $Rs=2GM/C^2$ ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন।

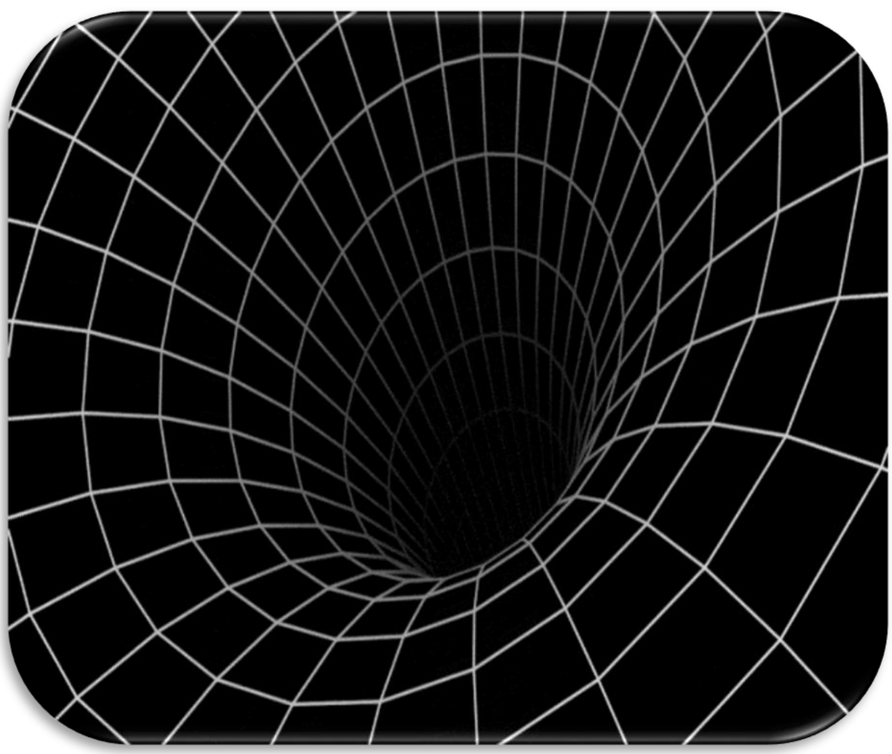

অধিক ভরের তারা যখন শেষ অবস্থায় বিচরণ করে তখন এর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে থাকে। অত্যাধিক হারে সংকুচিত হতে থাকে। বর্হিমুখী চাপ দেওয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না বলে সংকোচন নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না ফলে সংকোচন স্থান কালকেও ভয়ঙ্কর ভাবে বাঁকিয়ে দেয় যার জন্য এমন এক স্থান সৃষ্টি হয় যা থেকে আলোও উঠে আসতে পারে না। এবং এটাকে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর বা কৃষ্ণ বিবর। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এর আকৃতি অনেকটা মাছ শিকারের বস্তু ধারকির মতো। যেখানে প্রবেশের পথ থাকে কিন্তু বর্হিগমন পথ আটকানো থাকে। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুসারে, আলো শক্তিশালী মহাকর্ষ দ্বারা বেঁকে যায় এবং স্থান কালের বক্রতা অনুসরণ করে চলে। সূর্যের আড়ালকৃত তারার থেকে নিসৃঃত আলো সূর্য দ্বারা সৃষ্ট স্থানকালের বক্রতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বেঁকে যায় তবে সূর্যের ভর কম হওয়াতেই আমরা তা

দেখতে পাচ্ছি। এডিংটন সেই তারার আলো বেঁকে যাওয়ার ফলে এতে যে কৌণিক বিচ্যুতি তৈরি হয়েছিল তা পরিমাপ করেন এবং আইনস্টাইন হিসাব নিকাশ করে দেখিয়েছিলেন, সূর্যের দ্বারা সৃষ্ট স্থানকাল বক্রতার কারণে আলোর কৌণিক বিচ্যুতি হবে ১.৭৫ আর্ক-সেকেন্ড (আর্ক-সেকেন্ড হচ্ছে কোন পরিমাণের অতি ক্ষুদ্র একক। ১ আর্ক-সেকেন্ড = ১ ডিগ্রির ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র)।

এর অর্থ সূর্য দ্বারা আলো বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ খুবই কম হয়ে থাকে। কিন্তু ভর যদি এমন হয় যে আলো বক্রভাবে আমাদের চোখে আসার আগেই প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বেঁকে একস্থানেই রয়ে যাচ্ছে ফলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এই কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সর্ব বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বর হলো S50014+81 যেটার ভর সূর্যের চেয়ে ৪০ বিলিয়ন গুণ বেশি এবং যার ব্যাস ২৩৬.৭ বিলিয়ন কিলোমিটার সেটা পুরোপুরি ভাবে ধ্বংস হতে লাগবে (10^{100}) বছর। এবং সম্পূর্ণ ভর হারানোর সময় সেটা কয়েক বিলিয়ন পারমাণবিক বোমার সমান বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। কৃষ্ণগহ্বর মূলত কেন্দ্র কে নির্দেশ করে। যার ভেতরে আছে সিঙ্গুলারিটি। সিঙ্গুলারিটি এক্ষেত্রে অসীম ঘনত্বের কোনো পৃষ্ঠ হতে পারে, কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। বিজ্ঞানের এই ক্রম বর্ধমান সাফল্য মণ্ডিত অগ্র যাত্রায় কোন এক কালে এর সঠিক ব্যাখ্যা এবং সকল রহস্য দ্বার উন্মুক্ত হবে (ইন শা আল্লাহ্)।

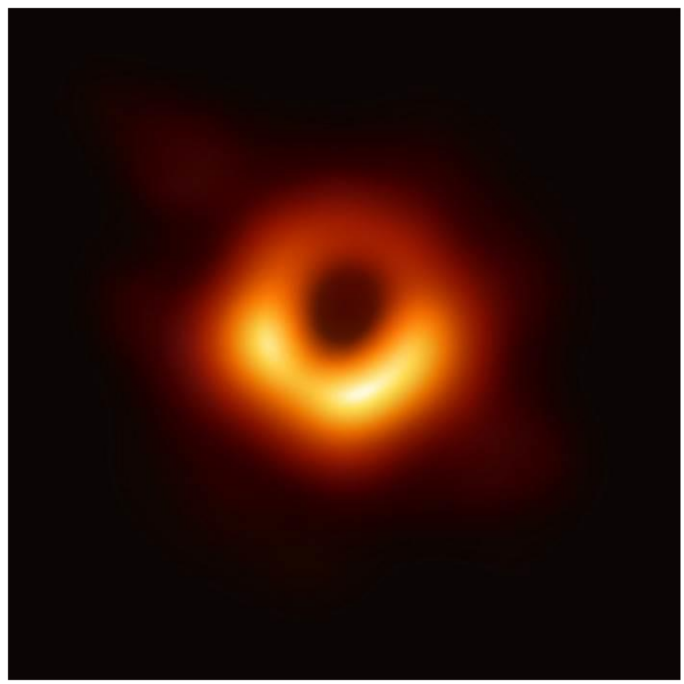

ব্ল্যাকহোলের আসল চিত্র

অ্যাপ রিভিউ

মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম শিমুল

০১. Brainly

হোমওয়ার্ক করতে বসলে মাঝেমধ্যেই মনে হয় না, এই সমস্যার সমাধান যদি পাওয়া যেত! তাহলে বেশ সুবিধা হতো। অর্থাৎ হোম টিউটরের মত করে সাপোর্ট পাওয়া যেত যদি! সেজন্যই আছে Brainly অসাধারণ একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ। এখানে সমস্যার ছবি পাঠিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যেই মিলবে সমাধান! কেননা এর রয়েছে একটি বিশাল কমিউনিটি। প্রতিমাসে ২৫০মিলিয়ন+ ব্যবহারকারী রয়েছে এতে। ৩৫টি+ দেশ থেক নিয়মিত এসব ব্যবহারকারী যুক্ত হন। তবে এর একটি সীমাবদ্ধতা হল, বাংলা ভাষায় এখনও তেমন কমিউনিটি গড়ে ওঠে নি। তাই যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজিতেই প্রশ্ন করতে হবে।

এবার দেখে আসা যাক এর ফিচারগুলো:

১. **বিশাল কমিউনিটি:** ২৫০মিলিয়ন+ ব্যবহারকারী প্রতিমাসে ব্যবহার করে।

২. **বিশেষজ্ঞ:** বিশেষজ্ঞগণের থেকে সমাধান পাওয়া।

৩. মোডারেটর: কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে কয়েক হাজার মোডারেটর।

৪. বিস্তৃতি: ৩৫টি+ দেশে রয়েছে এর বিস্তৃতি।

৫. বিনামূল্য: সেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। কোন প্রকার অর্থ দিতে হবে না।

৬. বিশাল ডেটাবেজ: এখন পর্যন্ত ৯৫মিলিয়ন+ প্রশ্ন করা হয়েছে এখানে।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: Brainly – The Homework App

রেটিং: ৪.৩

ইনস্টলের সংখ্যা: ৫, ০০, ০০, ০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.brainly

০২. BetonBook

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন? অফিসের করমিদের বেতন, ম্যানেজমেন্ট সঙ্ক্রান্ত জটিলতা নিয়ে চিন্তিত? আর চিন্তা করতে হবে না। এখন থেকে সবই হয়ে যাবে একটি মাত্র অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপেই! মজার ব্যপার হচ্ছে, এই অ্যাপটি বাংলাদেশেই তৈরি। ফলে ইংরেজি কেন্দ্রিক না হয়ে বাংলা ভাষাতেই ব্যবহার করতে পারবেন এই অ্যাপটি। তাও আবার বিনামূল্যেই পাচ্ছেন এই পরিসেবা!

এবার চলুন দেখে আসা যাক ফিচারগুলো

১. ম্যানেজমেন্ট: খুব সহজেই কর্মীদের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক উপস্থিতি, অর্ধদিন উপস্থিতি, ওভারটাইম কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারবেন।

২. কর্মী: কর্মীর কাজের ভিত্তিতে তাদের ম্যানেজ করা যাবে।

৩. বেতন: কর্মীদের বেতন দেয়ার কাজ একদম সহজেই করে ফেলা যাবে।

৪. রিমাইন্ডার ও নোটিফিকেশন: অ্যাপের অন্যতম চমৎকার ফিচার এটি। চাইলেই কর্মীদের এসএমএস-এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠাতে পারবেন তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি সম্বন্ধে।

৫. পেস্লিপ ও রিপোর্ট: বেতনের জন্য পেস্লিপ তৈরি করতে পারবেন পিডিএফ আকারে। সেটি সংরক্ষণ বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো যাবে।

৬. নিরাপত্তা: পাসওয়ার্ড ব্যবস্থা থাকায় তথ্য থাকবে ১০০% নিরাপদ।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: BetonBook: Staff Attendance, Work & Pay Management

রেটিং: ৪.৬

ইনস্টলের সংখ্যা: ১, ০০, ০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyantech.pagarbook.bn

০৩. CamScanner

মোবাইলে ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ যারা করেন তাদের জন্য খুবি উপকারী একটি অ্যাপ এটি। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের চোথা স্ক্যান করার জন্য এরচেয়ে ভালো অ্যাপ পাওয়া মুশকিল। এই অ্যাপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে এর স্ক্যানার। কম্পিউটার স্ক্যানারের মতই ক্যামেরা দিয়েই এই অসাধ্য সাধন করে ফেলে এই অ্যাপ। তবে এই অ্যাপের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ব্যবহার করতে হলে গুনতে হবে বেশ কিছু অর্থ। তারপরও ফ্রি ভার্সনে বেশ গুরুত্বপূর্ণসব ফিচার পাচ্ছেনই।

এর ফিচারগুলো হল:

১. দ্রুত স্ক্যানিং: এক ক্লিকেই ডকুমেন্ট রেডি! হ্যাঁ, অটোমেটিক ক্রপসহ দারুণসব ফিচারের কারণে একটি মাত্র ক্লিক করেই ডকুমেন্ট রেডি করে ফেলতে পারবেন।

২. সাক্ষর: ডকুমেন্টে সহজেই নিজের সাক্ষর যুক্ত করতে পারবেন।

৩. ফিল্টার: এতে আছে দারুণসব ফিল্টার। ফলে আপনার ডকুমেন্ট দেখতে প্রিন্টেড ভার্সনের মতই চকচকে মনে হবে।

৪. ওসিআর: এতে রয়েছে পাওয়ারফুল ওসিআর। ফলে লেখা সনাক্তকরণ হবে সুন্দরভাবেই।

৫. ক্লাউড: এর নিজস্ব ক্লাউডে সংরক্ষণ করতে পারেন ডকুমেন্ট। ফলে হারানো বা নষ্টের সম্ভাবনা নেই।

৬. ফরম্যাট: বই, আইডি কার্ডসহ বিভিন্ন ফরম্যাটে স্ক্যান করা যাবে।

৭. নিরাপত্তা: ডকুমেন্টকে চাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে নিরাপদে রাখতে পারবেন।

৮. ফাইল: পিডিএফ, জেপিজি ফরম্যাটে সহজেই ফাইলটি শেয়ার করতে পারবেন।

৯. সংযোগ: লগইন করে কাজ করলে সহজেই যেকোনো ডিভাইস (যেমন: মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাবলেট) থেকেই অ্যাকসেস করতে পারবেন আপনার ডকুমেন্টে।

এছাড়াও আরো অনেক কিছু।

অ্যাপের তথ্যাদি

নাম: CamScanner - Scanner to scan PDF

রেটিং: ৪.৪

ইনস্টলের সংখ্যা: ১০, ০০, ০০, ০০০+

ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner

শিক্ষা ওয়েব বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত
বিজ্ঞানাঙ্গন

আলোক উৎস

আহমেদ নির্ঝর

আমরা জানি, কোন পরমাণু বা অণুতে নিউক্লিয়াসের চারপাশে আবর্তনরত ইলেকট্রন প্রথমে শক্তি শোষণ করে উচ্চশক্তিস্তরে স্থানান্তরিত হয় । পরে শক্তি বিকিরণ করে ইলেকট্রন পুনরায় নিম্নশক্তিস্তরে ফিরে আসে । এই বিকিরিত শক্তিকে আমরা আলো নামে জানি। মূলত নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘের আলোকেই (380nm- 780nm) আমরা চোখে দেখে থাকি যাকে আমরা দৃশ্যমান আলো বলে থাকি। কিন্তু এগুলো কোয়ান্টাম বা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আলোর বিকিরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় যা শুধুমাত্র অণু ও পরমাণুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে আমাদের আশপাশে দেখা আলোকউৎস সম্পর্কে জানবো।

সাধারনত আকাশের সূর্য, তারামণ্ডল, ঘরের বাল্ব এগুলকে দীপ্তিমান বস্তু বলে। অপর দিকে চাঁদ, গাছপালা, পাহাড় ইত্যাদিকে দীপ্তিহীন বস্তু বলে। দীপ্তিহীন বস্তুগুলোকে আমরা তখনই দেখতে পাই যখন কোন দীপ্তিমান বস্তুথেকে আলো দীপ্তিহীন বস্তুতে পরে তারপর সেখান থেকে আলো আমাদের চোখে আপতিত হয়।

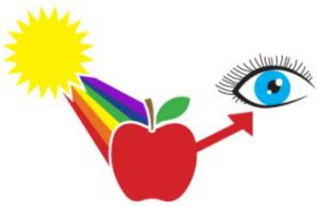

মূলত একটি বস্তু দীপ্তিমান নাকি দীপ্তিহীন তা নির্ভর করে বস্তুটির অবস্থা এবং যে পদার্থ দিয়ে বস্তুটি তৈরি তার উপর। আমরা কোন বস্তুর শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে দীপ্তিহীন বস্তুকে দীপ্তিমান বস্তুতে রুপান্তর করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্যে অবস্থিত ফিলামেন্ট দীপ্তিহীন বস্তু কিন্তু যদি একে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মাধ্যমে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে এটি দীপ্তিমান বস্তুতে পরিণত হবে।

বিভিন্ন প্রকার শক্তি ব্যবহার করে আমরা কোনো বস্তু থেকে আলোর বিকিরণ ঘটাতে পারি। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল তাপীয় বিকিরণ (Thermal radiation)। যখন কোনো বস্তুকে 300°C উত্তপ্ত করা হয় তখন সে বস্তু তাড়িতচুম্বকীয় বিকিরণ শুরু করে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ $\lambda = 5\mu m$। এক্ষেত্রে বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত অণু বা পরমাণুর গতি বৃদ্ধির ফলে এদের অভ্যন্তরীণ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যখন বস্তুর তাপমাত্রা 800°C তে পৌছায় তখন বস্তু থেকে কিছু দৃশ্যমান আলো নির্গত হয় তাই বস্তুটি উত্তপ্ত লাল রং এর দেখায়, বাকি শক্তি IR রশ্মি আকারে নির্গত হয়। আবার কোন বস্তুকে 3000°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে বস্তুটি সাদা আলো নির্গত করে। এই সকল বস্তুকে দ্যুতিময় (incandescent) বস্তু বলে। সকল আলোক উৎস দ্যুতিময় নয়।

শুধু মাত্র তাপীয় শক্তি তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরের মাধ্যমেই আলো উৎপন্ন হয়না। তাপ ছাড়া অন্যকোন প্রক্রিয়ায় আলো উৎপন্ন করাকে লুমিনিসেন্স (**Luminescence**) বলে। বিভিন্ন ধরনের লুমিনিসেন্স রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন দোকানের বিজ্ঞাপনে রাস্তার পাশে নিয়ন এবং আরো অনেক ধরনের উজ্জ্বল টিউব ব্যবহার করা হয় এই ধরনের বিকিরণকে ইলেক্ট্রোলুমিনিসেন্স বলে। এক্ষেত্রে টিউবে অবস্থিত গ্যাস অণুগুলোকে চার্জিত করার মাধ্যমে আলোর বিকিরণ ঘটান হয়। তাছারা অনেক প্রাণী যেমনঃ জোনাকি পোকা, কিছু মাছ এবং ব্যাকটেরিয়া থাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারনে আলোর বিকিরণ ঘটে। এই ধরনের বিকিরণকে কেমিলুমিনিসেন্স বলে। আমাদের বাসায় ব্যবহিত টিউব লাইট থেকে নির্গত আলোর বিকিরণকে ফোটোলুমিনিসেন্স বলে। টিউব লাইটের ভিতরে ফসফর পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে যা উৎপন্ন অতিবেগুনী রশ্মিকে দৃশ্যমান আলোয় রুপান্তর করে। টিভি এবং কম্পিউটার স্ক্রিনের আলোর বিকিরণকে ক্যাথডোলুমিনিসেন্স বলে যা স্ক্রিনে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রনের বিকিরণের কারনে হয়ে থাকে।